৬৫

পঞ্চ-পুষ্প

বা

[উপন্যাস-গুচ্ছ]

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়-প্রণীত।

[দ্বিতীয় সংস্করণ।]

কলিকাতা,
২০১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, "বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী", হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

আষাঢ়, ১৩০৯ সাল।

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়

পঞ্চ-পুষ্প।

আলেখ্য ।

উৎসর্গ-পত্র।

যিনি এখন পুণ্যালোক-বিভাসিত পিতৃলোকে,
এ মর্ত্ত্য-ভূমি হইতে অতিদূরে বাস
করিতেছেন,
যিনি মর্ত্ত্যে আমার প্রত্যক্ষ দেবতা ছিলেন,
যাঁহার অপরিমেয় স্নেহরাশির
কণামাত্রেরও পরিশোধ, এ ক্ষুদ্র জীবনে
অসম্ভব, আমার সেই চিরস্নেহময়
পিতৃদেবের স্মরণার্থে,
এই গ্রন্থ তাঁহার নামে উৎসর্গ
করিলাম।

বিজ্ঞাপন।

পঞ্চপুষ্পের দ্বিতীয়-সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে একটী নূতন গল্প সন্নিবেশিত করিয়াছি। গ্রন্থের আমূল পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী পাঠকসমাজ, ও বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান সংবাদ-পত্র সম্পাদকগণ, আমার ন্যায় ক্ষুদ্রশক্তি দীন গ্রন্থকারের এই সামান্য গ্রন্থখানিকে যেরূপ কৃপাদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বঙ্গীয় গ্রন্থকারদের আশ্রয়কেন্দ্রস্বরূপ স্বনামপ্রসিদ্ধ, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের যত্নে ও উৎসাহে বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। গুরুদাস বাবুর এ মহানু-ভবতার জন্য, আমি তাঁহার নিকট চিরবাধিত।

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

পঞ্চ-পুষ্প।

আলেখ্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রালোকিত যমুনাতীরে এক নিভৃত কুঞ্জ-বাটিকায় দাঁড়াইয়া দুইজনে কথোপকথন করিতেছিল। মধুর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে, চন্দ্রের বিমল রজত-রশ্মি যমুনার ঘনকৃষ্ণ সলিলে—সৈকত-ভূমিস্থ প্রস্তরময় সোপান-সমূহে—আর সেই

দুইজনের মুখে পড়িয়া বড়ই শোভা পাই-তেছিল। প্রকৃতি নিস্তব্ধ—সুবিমল শশিকরে সুপ্ত নববল্লরী-মধ্যে শ্বেতবর্ণ পুষ্পরাজি সেই নৈশ নিস্তব্ধতার মধ্যে সুগন্ধ বিকীর্ণ করিয়া নীরবে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাতলে বিশ্রাম করিতেছিল।

একজন বলিতেছে,—"তিলোত্তমে! অসার আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া ফল কি? তাহাতে কেবল যাতনা বাড়িবে বই ত নয়? তোমার পিতার শেষ কথা ত তোমায় বলিয়াছি। আমি দরিদ্র—তুমি ঐশ্বর্য্যশালীর কন্যা। যদিও আমি তোমার সহিত বংশ-গৌরবে সমকক্ষ, কিন্তু আমার কিছুই নাই। তোমার পিতা কেন তোমায় দরিদ্রের করে সমর্পণ করিবেন? তাই বলিতেছি, বৃথা কেন আমার জন্য কষ্ট পাও? তুমি সুপাত্রে সমর্পিতা হও; চিরজীবন তোমার সুখময় মূর্ত্তি, মধুর গুণাবলী স্মরণ করিয়া ভগি-নীর ন্যায় তোমায় স্নেহ করিব।"

তিলোত্তমা এ কথার কোন উত্তর করিল

না।' কেবল যন্ত্রণার অনলাশ্রু-রাশিতে তাহার নয়ন-যুগল ভাসিতে লাগিল।

যুবক ধীরে ধীরে বালিকার সেই কৌমুদী-বিধৌত অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তিলোত্তমে! তোমার এক একটী অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ে শত শত বিষাক্ত ছুরিকার আঘাত করিতেছে। আমি তোমার কষ্টের কারণ হইয়াছি—এ কথা ভাবিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া, আমাকে ভালবাসিয়া যেমন তোমার সুখ—আমারও ত সেইরূপ। আমাদের মিলন যদি বিধাতার অভিপ্রেত হয়, ত কেহই আমাদের বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। আমি আজ দেশ ছাড়িয়া চলিলাম, যদি কখনও অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আবার আসিয়া তোমার সঙ্গে মিলিব।"

তিলোত্তমা আকুল স্বরে কহিল—"আমি তোমার সঙ্গে যাইব—তোমার জন্য আমি পিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করিব।"

"তুমি আমার সঙ্গে যাইবে !! এ কি কথা তিলোত্তমে ? তোমার পিতা কি মনে করিবেন ? প্রতিবেশিমণ্ডলী, সমাজ কি মনে করিবে ? আর আমিই বা কোন্ সাহসে তোমায় লইয়া যাইব ? এ প্রকার যথেচ্ছাচারিতায় যে, তোমার পিতার সম্মানের পথে চিরকালের জন্য কাঁটা পড়িবে ? তোমার জন্য আমার জীবনকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি—কিন্তু কৃতঘ্নতার পরিবর্ত্তে তোমায় লাভ করিতে চাহি না। এই ঘটনায় তোমার পিতা মনস্তাপ পাইয়া সমাজের ভয়ে হয় ত আত্মনাশ করিতে পারেন। তিলোত্তমে ! ও কথা আর মুখে আনিও না। তোমার পিতার জীবনের মূল্যে—তাঁহার শোক-সন্তপ্ত চিত্তের রুষ্ট অভি-শাপের পরিবর্ত্তে—কৃতঘ্নতার বিনিময়ে তোমায় লাভ করা অপেক্ষা, শত জন্ম তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

কথাগুলি তিলোত্তমার মর্ম্মদেশ স্পর্শ করিল। তিলোত্তমা ঘোরতর নৈরাশ্যব্যঞ্জক

স্বরে প্রশ্ন করিল—"তবে কি আর কোন উপায় নাই ?"

"আছে—উপায় আছে। একমাত্র উপায় আমার অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন। মনে করিয়া দেখ, আমার বংশ-গৌরবে তোমার পিতার কোন আপত্তি নাই। তাঁহার আপত্তি এই যে, তাঁহার একমাত্র কন্যা তিনি দরিদ্রের হস্তে সমর্পণ করিতে সম্মত নহেন। আমার জন্য তিনি এক-বৎসর অপেক্ষা করিবেন—এ কথাও বলিয়াছেন। এই এক বৎসরের মধ্যে যদি আমার অদৃষ্টে প্রচুর ধনলাভ হয়, আমার অদৃষ্টের কোন পরি-বর্ত্তন হয়—তবেই আমি তোমায় লাভ করিতে পারিব। কিন্তু তিলোত্তমে! আমাদের উভয়ের প্রণয় যদি অকৃত্রিম, পবিত্র হয়, তবে নিশ্চয় জানিও, বিধাতার হস্ত আমাদের মিলন অবশ্য-ম্ভাবী করিয়া তুলিবে।"

কথাটা শেষ না হইতে হইতেই—সেই চন্দ্রকিরণ-মণ্ডিত তরঙ্গরাজির উপর তীব্র ক্ষেপণী-

চালন শব্দ শ্রুত হইল। রঞ্জনলাল সৌৎসুক্যে বলিলেন—"তিলোত্তমে! আর না, আমার নৌকা আসিয়াছে, নৌকায় আর দুই জন সহযাত্রী আছে—আমি উহাদের সঙ্গে আগরায় যাইব। যদি জগদীশ্বরী কখনও দিন দেন, তবে অদ্য হইতে দ্বাদশ পৌর্ণমাসীর পূর্ব্বে তোমার সহিত এই স্থানে সাক্ষাৎ করিব। তোমার পিতা যখন এক বৎসর অপেক্ষা করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার অন্যথা হইবে না।" রঞ্জন এই কথা বলিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে সেই সৈকতভূমি অতিক্রম করিয়া নৌকায় উঠিলেন। হৃদয়ের যাতনা-ব্যঞ্জক এক মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘনিশ্বাস ধীরে ধীরে সেই ঘনকৃষ্ণ নদীবক্ষোব্যাপী তরঙ্গোচ্ছ্বাস-শব্দমধ্যে মুহূর্ত্তে মিশাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তিলোত্তমার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিলোত্তমা এলাহাবাদের কোন এক বিখ্যাত শ্রেষ্ঠীর কন্যা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে গৌরবান্বিত সাহানসা আকবরসাহ দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজ করিতেছিলেন। তিলোত্তমার পিতার নাম ধনশ্রী দাস। ধনশ্রী দাস আকবরের সভার একজন বিখ্যাত রত্নবণিক্। ধনশ্রীর সম্মানের যথেষ্ট পরিচয় এই যে, দিল্লীশ্বর তাঁহাকে চিনিতেন। তিলোত্তমা যখন আট বৎসরের বালিকা, তখন সে একবার পিতার সঙ্গে আগরায় গিয়াছিল। বাদসাহ সেই প্রভাত-কমলবৎ বালিকার অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—"ধনশ্রী! তোমার কন্যা এক দিন রূপগৌরবে সমস্ত হিন্দুস্থান উন্মত্ত করিয়া তুলিবে।"

তিলোত্তমা পিতার একমাত্র সন্তান। অল্প বয়সে মাতৃহীনা, সুতরাং পিতার আরও আদ-

রের সামগ্রী। ধনশ্রী তিলোত্তমার জন্য সুপাত্র অনুসন্ধানেও ত্রুটি করেন নাই। নানাস্থান হইতে সম্বন্ধও আসিয়াছিল, কিন্তু কোনটীই তাঁহার মনোনীত হয় নাই। দূর দেশ হইতে দুই একটী সম্বন্ধ আসিয়াছিল, পাত্রও ধনশ্রীর মনের মত, কিন্তু দূর বলিয়া তিনি সে বিবাহে সম্মত হইলেন না।

রঞ্জনলাল আশ্রয়হীন, পিতৃমাতৃহীন যুবক। রঞ্জনের পিতাও ধনশ্রীর সমব্যবসায়ী। কিন্তু তিনি অতি উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন। ধনশ্রীর অপেক্ষা তিনি অধিক উপায় করিতেন, কিন্তু অপব্যয়ে তাঁহার সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইত। রঞ্জনলাল যখন দশ বৎসরের, তখন তাহার মাতৃ-বিয়োগ হয়। তাহার পিতাও পর বৎসর ইহলীলা সংবরণ করেন।

পিতার মৃত্যুর পর রঞ্জনলাল একাকী নিরাশ্রয় হইয়া সংসার-সমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। ধনশ্রী রঞ্জনলালের নিঃসহায় অবস্থা

দেখিয়া তাহাকে নিজ গৃহে আনিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ধনশ্রীর গৃহিণী যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রঞ্জনলাল মাতৃশোক ভুলিয়াছিল। দুইটী বালক বালিকা একত্রে আহার করিত, তিনি তাহাদের দুই জনকে দুই পার্শ্বে রাখিয়া ঘুম পাড়াইতেন। প্রভাতে প্রভাত-রশ্মি মাখিয়া যমুনা যখন মৃদুল বাতাসে লহরী তুলিয়া আপন মনে উজান বহিত, বালক বালিকা তখন রাশি রাশি ফুল কুড়াইয়া লইয়া যমুনার জলে ভাসাইয়া দিত। "ঐ আমার ফুলটা আগে ভাসিয়া গেল, রঞ্জন দাদার ফুল ত বেশী দূরে গেল না"— বালিকা এই কথা বলিয়া উচ্চরবে হাস্য করিত। গাছের উপর ঘন পল্লবাবৃত শাখায় বসিয়া পাপিয়া যখন ডাকিয়া উঠিত, সেই মধুর স্বর যখন প্রভাত-বায়ুতে পরিচালিত হইয়া নীল গগনের কোলে চারিদিক ব্যাপিয়া ছড়াইয়া পড়িত, বালিকা তখন কোমল কর-পল্লবে মুখ-

খানি ঢাকিয়া পাপিয়ার স্বর অনুকরণ করিয়া ডাকিয়া উঠিত। রঞ্জন না খাইলে বালিকা খাইত না, রঞ্জনলাল পাঠ বলিয়া না দিলে বালিকা পড়িত না, রঞ্জন দাদা বাগানে বেড়াইতে না গেলে বালিকা সেদিকে যাইত না, রঞ্জন দাদা ফুল গুছাইয়া না দিলে বালিকা মালা গাঁথিত না। তাহাদের এই বাল্য-সৌহার্দ্দ দেখিয়া গৃহিণী কখন কখন বলিতেন,—"ইহারা যেন এক বৃন্তে দুইটী ফুল—আমি ইহাদের বিবাহ দিব।"

গৃহিণী যদি বাঁচিয়া থাকিতেন, তাহা হইলে ইহাদের বিবাহের কোন অসম্ভাবনাই থাকিত না। এমন কি, রঞ্জনলালের পিতাও যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও এই বালক বালিকার মিলন সুদূর-পরাহত হইত না।

সংসারে কতকগুলি লোক আছে—পরের অনিষ্ট করিতে পারিলেই তাহাদের আনন্দ। তাহাদের নিজের স্বার্থ অগ্রসর হয়—হউক,

তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু না হইলেও তাহারা স্বভাব ছাড়িয়া পথ চলে না। ধনশ্রীর কাছে এই প্রকার কতকগুলি লোক আসিয়া এই সময়ে জুটিল। তাহাদের চেষ্টা—রঞ্জনলালের সহিত ধনশ্রীর কন্যার বিবাহ না হয়। নানাপ্রকার কাণাঘুষা চলিতেছে দেখিয়া, ধনশ্রীর মনে মনে ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি রঞ্জনের সহিত তিলোত্তমার বিবাহ-বিচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

তিলোত্তমা বালিকা—তাহার কোন দোষ নাই; কিন্তু রঞ্জনলাল তাহার সম্মুখে প্রলোভনের মত কেন বসিয়া থাকে? ধনশ্রী ভাবিলেন, রঞ্জনলালকে বাটী হইতে বিদায় করিতে না পারিলে তাঁহার উদ্দেশ্য-সিদ্ধি দুরূহ হইয়া উঠিবে।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া তিনি এক দিন রঞ্জনলালকে ডাকাইলেন, বলিলেন—"দেখ, তিলোত্তমা এমন বড় হইয়াছে—আর তোমাদের উভয়ের একত্রে থাকা ভাল দেখায় না। আর তোমারও

নিশ্চেষ্ট হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকাও ভাল নয়। এইবেলা হইতে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করা আবশ্যক। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে কখন অদৃষ্ট প্রসন্ন হয় না। আমি জানিয়াছি, তিলোত্তমা তোমার প্রতি আসক্তা—তোমাকে তাহার চক্ষের সম্মুখ হইতে অন্তরাল না করিতে পারিলে সে তোমায় ভুলিবে না। তোমায় আমি এতদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি; কিন্তু অলসতার প্রশ্রয় দিয়া তোমায় অকর্ম্মণ্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। তোমায় একখানি পত্র দিতেছি,—সেই খানি লইয়া আমার বন্ধুর নিকটে আগরায় যাও। তিনি তোমাকে বাদসাহ সরকারে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। তুমি যেরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমার উন্নতি হইবে। আর দেখ, তোমার জন্য আমি এক-বৎসর অপেক্ষা করিব, ইহার মধ্যে তুমি যদি নিজের অবস্থা উন্নত করিতে পার, ত তিলোত্তমার সহিত তোমার বিবাহও অসম্ভব হইবে না।”

রঞ্জনলাল নির্ব্বাক্ হইয়া নির্ব্বাত জলধির ন্যায় স্থিরভাবে এই সব শ্রুতিকঠোর কথা শুনিলেন, কোন কথার উত্তর করিলেন না—কারণ তাঁহার সেরূপ অধিকার নাই। নতশিরে ধনশ্রী-প্রদত্ত অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ ত্রিশটী মুদ্রা লইয়া নীরবে সেই স্থানত্যাগ করিলেন। রঞ্জন অশ্রুজল লইয়া সেই বাড়ীতে ঢুকিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই সঙ্গে লইয়া গেলেন।

রঞ্জনলালের সেই দিনের সেই অশ্রুপূর্ণ মুখখানি, ধনশ্রী ইহজীবনে ভুলেন নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘনকৃষ্ণ সলিলরাশি হৃদয়ে ধরিয়া—সুবর্ণময় সৌরকর অঙ্গে মাখিয়া, যমুনা কুল কুল রবে অনন্ত উদ্দেশে চলিয়াছে। উপরে সুনীল আকাশ অনন্তের বিশ্বব্যাপী প্রতিকৃতি। সেই নীল আকাশের নীচে—শুভ্র-তূলারাশিবৎ মেঘখণ্ড এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। যমুনার

উপরেই লোহিতবর্ণ প্রস্তর-নির্ম্মিত কঠোরকায় প্রকাণ্ড দুর্গ! যেন কাল যমুনা ও নীল আকাশের মধ্যে একমাত্র প্রকাণ্ড ব্যবধান। রঞ্জনলাল আগরা দুর্গের ঘাটে অবতরণ করিয়া সহরে প্রবেশ করিলেন।

যমুনা আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে—তাহার পার্শ্বে আকবর সাহের বিশাল-দর্শন দুর্গ। দুর্গের উপর হইতে সেই সময়ে ভৈরবী রাগিণীতে মধুর নহবৎ বাজিতেছিল। রঞ্জনলাল যেমন দুর্গের সর্ব্বোচ্চ মিনারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে যাইবেন, অমনি তাঁহার মাথার পাগড়ী ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। নিকটে কতকগুলি বালক খেলা করিতেছিল—তাহারা উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠাতে, রঞ্জনলাল অপ্রতিভ হইয়া সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

মোগল রাজত্বের এই সময়ে পূর্ণ বিকাশ অবস্থা। আগরা ধন-জন-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, সেই দিকেই ঐশ্বর্য্যের

সমাবেশ। আমীর ওমরাহগণের পতাকা-চিহ্নিত সৌধ, চক্রের পণ্যরাজিপূর্ণ সুবিস্তৃত পণ্যশালা, অত্যুন্নত জনতা-সঙ্কুল মনোরঞ্জন প্রমোদ-উদ্যান যেন চারিদিকেই ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ। কোথাও বা মধুর রাগ-রাগিণীতে নহবৎ বাজিতেছে, কোথাও বা মৃদঙ্গের মৃদুগম্ভীর নিনাদের তালে, কলাবৎগণ খেয়াল ধ্রুপদের আলোচনা করিতেছে—কোথাও বা যুবতীর কোমলকণ্ঠ সারঙ্গের সহিত মিশিয়া মধুর কাকলী উৎপাদন করিতেছে—আবার কোন স্থান সৈনিকের অস্ত্র-ঝন্‌ঝনায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

রাজপথে অগণ্য জনস্রোত। যেন অনন্তের সূক্ষ্ম রেখা কোথা হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কোথায় গিয়া শেষ হইবে, কেহ বলিতে পারে না। কোথাও বা নানা বর্ণে চিত্রিত হস্তিবৃন্দ হস্তিপকের দ্বারা চালিত হইয়া, দন্তভরে রাজপথ অতিক্রম করিতেছে—কোথাও বা তাঞ্জামে চড়িয়া কোন ওমরাহ রাজসভায় চলিয়াছেন—

আবার কোথাও বা শত শত অশ্বের হ্রেষারব সৈনিকের কোষবদ্ধ তরবারি-ঝন্‌ঝনার সহিত মিশিয়া, রাজপথকে শঙ্কাকুলিত করিতেছে।

রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে, চক অতিক্রম করিলেন। ধনশ্রী তাঁহাকে যে অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন, অভিমানবশে তিনি তাহার কোন ব্যবহার করিলেন না। ধনশ্রীর আত্মীয়ের নিকট না গিয়া তিনি একেবারে তাঁহার প্রিয়বন্ধু প্রতাপরামের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

বাড়ীর সন্ধান করিতে বিশেষ কষ্ট হইল না—তাহার কারণ, প্রতাপরামের নাম আগরার ছোট বড় সকলেই জানিত। প্রতাপ আগরার একজন বিখ্যাত তসবীরওয়ালা। যত বড় বড় আমীর ওমরাহ—এমন কি স্বয়ং বাদসাহ পর্য্যন্ত তাঁহার খরিদ্দার।

প্রতাপের যশ তাঁহার নিজের সম্পত্তি নহে। তাঁহার পিতা দিল্লী ও আগরার একজন প্রধান চিত্রকর ছিলেন। চিত্রবিদ্যা-অবলম্বনে

তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করিয়া গিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একমাত্র পুত্র প্রতাপই তাঁহার কারবারের উত্তরাধিকারী। প্রতাপও পিতার গুণ পাইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অল্প বয়সে চিত্রাঙ্কন কার্য্যে আগরায় কেহ অতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রতাপ রঞ্জনের বাল্যকালের বন্ধু। অনেক দিনের পর দুই বন্ধুতে সাক্ষাৎ হইল। দুই জনেই যথেষ্ট প্রীতি লাভ করিলেন। রঞ্জনের মুখে তাঁহার স্বদেশ-ত্যাগের কারণ অবগত হইয়া তিনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং প্রতিশ্রুত হইলেন, যত শীঘ্র পারেন তাঁহার একটী কর্ম্ম করিয়া দিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দিনের পর দিন গেল—প্রতিদিন প্রভাতে যেমন প্রকৃতির হরিতবর্ণ মস্তকে হিরণ্য-প্রবাহ ঢালিয়া প্রভাত-সূর্য্য প্রাচীদিকে উদিত হইয়া

থাকেন, আর সন্ধ্যার সময় ঘোর রক্তাভ কিরণ-মালায় যমুনার কাল জল ও আকবরের লোহিত দুর্গ রঞ্জিত করিয়া থাকেন, সেই রূপই করিতে লাগিলেন—কিন্তু রঞ্জনের কাজ কর্ম্মের কোন সুবিধা হইল না।

অনন্তকালের ক্ষুদ্রতম অংশ হইলেও দিন কাটান রঞ্জনের পক্ষে অতি দুরূহ হইয়া উঠিল। তিলোত্তমার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাঁহার মনের যে সুখ নষ্ট হইয়াছিল, আগরার বিশাল ভাবের মধ্যে পড়িয়াও তাহার কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি কখন যমুনা-তীরে, কখনও দুর্গ-প্রাঙ্গণে, কখনও বা প্রতাপের চিত্রশালায় চিত্র দেখিয়া—কখনও বা পুস্তক-পাঠে কাল কাটাইতেন। প্রতাপ অনেক বড় বড় লোককে, রঞ্জনের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে তিনি প্রতাপের পাঠগৃহে বসিয়া আছেন, একখানি পুস্তক পাঠ

করিবার চেষ্টা করিতেছেন—কিন্তু কিছুতেই মনঃসংযোগ হইতেছে না। তিনি ধীরে ধীরে পুস্তক ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একবার বাতায়ন-পথে আগরার বাহ্য-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কিন্তু তাঁহার চিন্তা-পীড়িত হৃদয়ে সে বিশাল সৌন্দর্য্য ভাল লাগিল না। তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া প্রতাপের চিত্র-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

সুকুমার শিল্পের যতদূর চরমোৎকর্ষ দেখান যাইতে পারে, প্রতাপের চিত্র-গৃহে তাহার একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। চিত্রগুলি বর্ণ-রঞ্জিত হইলেও যেন অতি প্রকৃত বলিয়া উপলব্ধি হইতেছিল। এই জন্যই বোধ হয়, কবি ও চিত্রকরের মধ্যে বিশেষ বিভিন্নতা নাই।

রঞ্জনলাল চিত্রগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্বেলিত হৃদয় কতক শান্ত হইল। চিত্রগৃহের চারিদিকে বিচিত্র চিত্র ও দর্পণাদিতে পরিশোভিত। মধ্যস্থলে বিবিধ কারু-কার্য্য-খচিত উপবেশনের স্থান। দর্শক ক্লান্ত

হইলে এই আসনে উপবেশন করেন। রঞ্জনলাল যে গৃহে ছিলেন, তাহার পার্শ্বেই একটী দ্বার—তৎপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গৃহ। এইটী প্রতাপের চিত্রগৃহ। এই গৃহে বসিয়া প্রতাপ আলেখ্য চিত্র করিতেন। রঞ্জনলাল চিত্র-পরিদর্শন শেষ করিয়া পাশের ঘরে গেলেন—বন্ধুর চিত্রকার্য্য দেখিবেন এই সাধ। কিন্তু গৃহ-মধ্যে প্রতাপ নাই, তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর এক ব্যক্তি সেই গৃহে উপবিষ্ট।

এই লোকটী রঞ্জনের নিকট পরিচিত নহে। কেননা প্রতাপের বাটীতে থাকিয়া রঞ্জনের সহিত অনেকের আলাপ হইয়াছিল। রঞ্জন দেখিলেন, লোকটী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে অর্দ্ধ-চিত্রিত অপরিস্ফুট বর্ণ-বিন্যস্ত এক বৃহৎ আলেখ্য। আশে পাশে কতকগুলি তূলিকা ও ফলিত রং পড়িয়া আছে। প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ উঠে নাই। যাহা উঠিয়াছে, তাহা সেই আগন্তুকের প্রতিমূর্ত্তির অব্যক্ত ছায়া মাত্র।

রঞ্জনলাল লোকটাকে দেখিয়া বড় আশ্চর্য্য হইলেন। এ ব্যক্তি অতি দরিদ্র। ইহার শরীর আদ্যোপান্ত ছিন্ন ও মলিন বস্ত্রে আবৃত। দেখিলে বোধ হয়, যেন মূর্ত্তিমান দারিদ্র্য আসিয়া প্রতাপের চিত্রশালায় বসিয়া রহিয়াছে।

আগন্তুকের অঙ্গরাখাটী সম্পূর্ণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন ও মলিন। মাথায় একটী পাগড়ী আছে, তাহা আবার ততোধিক বিবর্ণ—যত রাজ্যের ধূলা ময়লা তাহার মধ্যে। তাহার গলায় এক ছড়া তবলকীর মালা। পায়ের জুতা জোড়াটী শত জায়গায় তালি দেওয়া। হাতে একটী ভিক্ষাপাত্র। রঞ্জনলাল দেখিলেন, এই ছিন্নকন্থা ভিক্ষুকেরই প্রতিকৃতি চিত্রিত হইতেছে। প্রতাপ কি উন্মাদ!! এই হতভাগ্য ভিক্ষুকের চিত্র কার্য্যে এত পরিশ্রম, বর্ণ ও তূলিকার অপব্যয় কেন?

রঞ্জন প্রতাপকে মনে মনে নিন্দা করিলেন। কিন্তু এই দরিদ্র আগন্তুকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হই-

লেন না। তাহার কাছে উপবিষ্ট হইয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! প্রতাপ কোথায় বলিতে পার?"

ভিক্ষুক যে রঞ্জনলালকে তাঁহার গৃহপ্রবেশের আরম্ভ হইতে আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল, তাহা তিনি দেখিতে পান নাই। রঞ্জনের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার দৃষ্টি নিম্নে সংযত হইল, ভিক্ষুক ধীরে ধীরে উত্তর করিল—

"প্রতাপ কে?"

"কেন এই বাটীর অধিকারী—যিনি তোমার চিত্র আঁকিতেছেন।"

"প্রতাপ ফ্রতাপ জানি না—তবে যে মহানুভব ব্যক্তি আজ আমায় দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিয়াছেন, তিনিই বুঝি প্রতাপ?"

"হাঁ—হাঁ তিনিই। তিনিই তোমার চিত্র করিতেছেন। আচ্ছা তুমি এই না বলিলে, সে তোমায় ডাকিয়া আনিয়াছে, এতলোক থাকিতে তোমায় ডাকিল কেন, আর তোমার ছিন্ন-কন্থা-

বৃত প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াই বা তাহার কি লাভ ?”

ভিক্ষুক ধীরে ধীরে উত্তর করিল— “মহাশয় ! আমি অতি দুর্ভাগ্যবান, আমার কথা শুনিলে আপনি অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। আপনি বোধ হয় তাঁহার আত্মীয় হইবেন—সুতরাং তিনি আমায় কেন এখানে আনিয়াছেন তাহা আপনাকে বলিতে আমার আপত্তি নাই।”

“বল ভাই বল—আমি তোমার দুঃখের কাহিনী শুনিব, আমিও তোমার ন্যায় এক জন পথ-পরিত্যক্ত ভিক্ষুক।”

ভিক্ষুক নিজের কাহিনী বলিতে লাগিল— “মহাশয় ! আমি এই আগরা নগরে এক সম্ভ্রান্ত বণিক ছিলাম—কিন্তু দুর্ভাগ্যবশে এইরূপ পথের ভিখারি হইয়াছি। আমি এক সময়ে প্রকাণ্ড অট্টালিকায় বাস করিতাম, কিন্তু এখন দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই। শত শত লোককে

অন্ন দিতাম, এখন নিজে একমুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত। যে সকল লোক আগে আমায় দেখিলে সাদরে সংবৰ্দ্ধনা করিত, এখন তাহারা আমায় দেখিলে মুখ ফিরায়—ভিক্ষার জন্য তাহাদের দ্বারে গেলে, দ্বার বন্ধ করিয়া দেয়। আমি আজ চারি দিন অনাহারী। পথে পথে বেড়াইতেছি—এক মুষ্টিও ভিক্ষা পাই নাই। কাল সমস্ত রাত্রিটা অনাহারে উন্মুক্ত রাজপথে কাটাইয়াছি। ধনীর রাশীকৃত সুপাচ্য অন্ন, কুক্কুরের কুক্ষিগত হইয়াছে—কিন্তু আমি একমুষ্টি পাই নাই। নিজের জন্য ভাবি না—কিন্তু আমার ন্যায় হতভাগ্যকেও পরমেশ্বর স্ত্রী পুত্র দিয়াছেন, তাহাদের জন্যই আমার যত ভাবনা। আজ মধ্যাহ্নে এই বাটীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী দয়া করিয়া আমায় উপরে ডাকিলেন। বলিলেন দেখ—"তোমায় লইয়া আমার একটু কাজ হইবে—তোমায় আমি তৎপরিবর্ত্তে পারিশ্রমিক দিব। আমার চিত্রশালায়

সব চিত্রই আছে, কিন্তু অতি হীন দরিদ্রের চিত্র নাই। আগরা সহরে আমি এত দিন আছি, কিন্তু তোমার ন্যায় দরিদ্রতার জীবন্তমূর্ত্তি কখনও কোথাও দেখি নাই। আমি তোমার চিত্র প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিলে নিশ্চয়ই প্রচুর অর্থ পাইব, এবং তোমায় যথেষ্ট পুরস্কার দিব। কাজেই আমি এখানে বসিয়া আছি। ঐ দেখুন আমার চিত্র হইতেছে—”

রঞ্জনলাল একবার সেই চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—পুনরায় ভিক্ষুকের প্রতি করুণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—“ভাই! তবে তোমার এখনও কিছুই খাওয়া হয় নাই।”

“খাওয়া চুলোয় যাক্—জলস্পর্শও করি নাই।”

“তবে একটা কাজ কর—এখন ত চুপ করিয়া বসিয়া আছ—আরও চিত্রও হইতেছে না—তুমি এই কয়টি পয়সা লও। এই বাড়ীর পার্শ্বে এক দোকান আছে, সেখান হইতে কিছু মিঠাই

কিনিয়া খাও। আমি নিজে দরিদ্র, যাহা কিছু আনিয়াছিলাম, সবই খরচ হইয়াছে—নিজের খরচের জন্য এই কয়টি পয়সা মাত্র ছিল। দেখ! দরিদ্রের দান অবহেলা করিও না। আমার দিব্য, তুমি এই কয়েকটি পয়সা লইয়া জল খাইয়া আইস।” এই কথা বলিয়া রঞ্জনলাল কয়েকটি পয়সা সেই ভিক্ষুকের হাতে গুঁজিয়া দিলেন।

রঞ্জনের এই দয়া ও হৃদয়ের অস্বাভাবিক উদারতা দেখিয়া, ভিক্ষুকের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। তাহার মুখমণ্ডলে কৃতজ্ঞতার ভাব প্রকটিত হইল। সে পয়সাগুলি লইয়া বলিল—“মহাশয়! আমায় ত সব দিলেন, কিন্তু আপনি কা’ল কি করিবেন?”

“আমার জন্য ভাবিও না—কা’লকের উপায় কাল হইবে। বিধাতা আছেন।”

“আচ্ছা আপনার দয়ার জন্য শত শত ধন্যবাদ। এই পয়সায় আপনি আমাকে খাইতে বলিতেছেন, কিন্তু ইহাতে আমাদের সপরিবারের একদিন চলিবে।”

"আচ্ছা তবে বাটী লইয়া যাইও। আমার আর কিছু নাই—" এই সময়ে রঞ্জনলালের দৃষ্টি সহসা তাঁহার অঙ্গুলির উপর নিপতিত হইল।

"আমার আর কিছু নাই—কিন্তু এখনও এই অঙ্গুরীয়কটি আছে, তুমি ইহা লও, ইহা বিক্রয় করিয়া যাহা হইবে, তাহাতেও তোমার কিছু সাহায্য হইবে।"

"না—ও অঙ্গুরীয়ক আমি লইব না। আমি শত জন্ম অনাহারে মরি সেও ভাল, কিন্তু এ দুষ্কার্য্য আমার দ্বারা হইবে না।"

"ভাই! তুমি বুঝিয়া দেখ, আমার উপহার প্রত্যাখান করিও না। এই অঙ্গুরীয়ক থাকিলে আমার কি বিশেষ উপকার হইবে? তদপেক্ষা যদি তোমার কাজে লাগে ত তাহাতে আমার যথেষ্ট সুখ হইবে। জানি ও—দাতা ইচ্ছা ও ক্ষমতানুসারে দান করেন—গ্রহীতার মতামতের অপেক্ষা করেন না।"

ভিক্ষুক কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে

বলিল,—“আমি দরিদ্র, সকলেই জানে—ইহা বিক্রয় করিতে গেলে রত্নবণিক নিশ্চয়ই আমায় চোর বলিয়া ধরাইয়া দিবে।”

“না—তাহার কোন সম্ভাবনা নাই—উহার দাম তত বেশী নয়, যে কেহ তোমায় সন্দেহ করিবে। যদি করে ত তাহাকে আমার কাছে আনিও।”

“আচ্ছা মহাশয়! যদি আপনি ইহাতে সন্তুষ্ট হন—তাহাই হইবে।”

প্রতাপ তখনও গৃহে প্রবেশ করেন নাই, তিনি অন্য গৃহে কার্য্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। রঞ্জন-লাল ভিক্ষুককে—“তুমি অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি”—বলিয়া গৃহত্যাগ করিলেন।

প্রতাপ ইহার কয়েক মুহূর্ত্ত পরে গৃহপ্রবেশ করিলেন। সেই ছিন্ন-কন্থাবৃত ভিক্ষুককে সসম্ভ্রমে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—“জাঁহাপনা! অধম বড়ই কষ্ট দিয়াছে, বর্ণের সামঞ্জস্য না হওয়াতে বড় বিলম্ব হইল। গোস্তাখি মাপ করিবেন—”

"না—না—তোমার কোন গোস্তাখি হয় নাই, স্থির হও—যা প্রশ্ন করি, তার উত্তর দাও। তোমার বাটীতে যে একটি যুবক আসিয়াছে, উটি তোমার কে?"

প্রশ্ন শুনিয়া প্রতাপের মুখ শুষ্ক হইল। তিনি বিনীত ভাবে কহিলেন,—"সাহান্-সা! ভারতেশ্বরের নিকট কি সে ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে?"

"হাঁ—সে গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার আর মার্জ্জনা নাই।"

প্রতাপের মুখ আরও শুখাইয়া গেল। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে নতজানু হইয়া সহসা সেই ভিক্ষুকের পদতলে বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুকবেশী ধীরে ধীরে প্রতাপকে উঠাইলেন, বলিলেন,—"প্রতাপ! আমি জানিয়াছি, আগন্তুক তোমার বন্ধু—তুমিই সৌভাগ্যবান। তা না হইলে, তোমার অদৃষ্টে এমন বন্ধুলাভ ঘটিবে কেন? তোমার বন্ধুর হৃদয় অতি উদার, অতি প্রশস্ত,

প্রচুর মহত্ত্ব-পরিপূর্ণ। এই দেখ তাহার নিদর্শন”—বলিয়া তিনি নিজ হস্তের অঙ্গুরীয়ক দেখাইলেন।

প্রতাপ দেখিলেন, অঙ্গুরীয়ক—রঞ্জনলালের। তাহার অঙ্গুরীয়ক ইঁহার হাতে কিরূপে আসিল, ইহা তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। শুষ্ক মুখে প্রতাপ বলিলেন—“জাঁহাপনা! দাস উপহাসের যোগ্য নহে, আপনি যে উপহাস করিতেছেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়। প্রকৃত কথা খুলিয়া বলুন, নচেৎ কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না।”

ভিক্ষুকবেশী,—রঞ্জনলালের সহিত তাঁহার যে কথোপকথন হইয়াছিল, কেন রঞ্জনলাল তাঁহাকে অঙ্গুরীয়ক দান করিয়াছেন,—সমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিলেন। প্রতাপ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভিক্ষুক চলিয়া গিয়াছেন। প্রতাপ একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার মুখমণ্ডল, মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছে। উদ্বেগে ললাটের শিরা-গুলি স্ফীত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের সমতা হইয়াছে। তিনি আপনা আপনি বলিতেছেন—"নির্ব্বোধ রঞ্জনলাল! করিয়াছ কি? সমগ্র হিন্দু-স্থান যাঁহার পদতলে—গোলকুণ্ডার হীরকের খনি যাঁহার ঐশ্বর্য্যের শতাংশের একাংশ—যিনি সময়-বিশেষে শত সহস্র, লক্ষাধিক স্বর্ণ রজতমুদ্রা মণি-মুক্তাদিতে তৌলিত হয়েন—তাঁহাকে তুমি দরিদ্র ভাবিয়া কয়েক খণ্ড তাম্র মুদ্রা দিয়াছ—ইহা অপেক্ষা তোমার বেশী প্রগল্‌ভতা আর কি হইতে পারে? যাঁহার কৃপা-কটাক্ষ পাইবার জন্য হিন্দুস্থানের শতশত রাজন্যবর্গ আগ্রহের সহিত আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে কি না সামান্য ধাতুময় অঙ্গুরীয়ক দিয়া কৃপা দেখাইয়াছ?—"

এই সময়ে রঞ্জনলাল একখানি পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্য দ্রব্য আনিয়া প্রতাপকে সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই! সেই দরিদ্র ভিক্ষুক কোথায় গেল? সে অনাহারে তিন দিন কষ্ট পাইয়াছে বলিয়া, আমি তাহার জন্য এই মিষ্টান্ন আনিয়াছি—"

প্রতাপ বলিলেন—"রঞ্জন! তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ ভাই? একটুও বুদ্ধি নাই তোমার!"

"কেন ভাই কি করিয়াছি? এমন কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি? কই—না, কিছুই ত করি নাই—তবে খাবার কিনিতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। আমি বাজারে গিয়াছিলাম, কাজেই একটু দেরী হইয়াছে। তোমার চাকরদের পাঠাইলে ত ভাই আরও দেরি হইত। যাক্ ও কথা, এখন সে ভিক্ষুক গেল কোথায়?

"রঞ্জন! তুমি কি বাতুল? তুঙ্গশৃঙ্গ হিমাচলকে তা না হইলে স্থাণুর বলিবে কেন? যাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্য, শত শত রাজন্যবর্গ যাঁর

পদানত, হিন্দুস্থান যাঁর অসির ঝন্‌ঝনাতে শশব্যস্ত, তুমি সেই রাজার রাজা—সম্রাটের সম্রাট্‌কে, ভিক্ষুক বলিবে কেন ?”

রঞ্জন এ সব কথার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন—“ভাই! কেন বৃথা রহস্য করিতেছ—এখন রহস্যের সময় নয়। কোথায় সেই অনাহারী দরিদ্র ভিক্ষুক, বলিয়া দাও, আমি তাহাকে এইগুলি খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত হই।”

“সেই ভিক্ষুক এতক্ষণে যেখানে গিয়াছে, সেখানে এখন প্রবেশ করিতে গেলে, হয় ত তোমার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে।”

রঞ্জনলাল এ কথারও মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—কি যেন, কেমন হইয়া গেলেন। তখন প্রতাপ উত্তর করিলেন—“ভাই রঞ্জন! আমি তোমার সহিত রহস্য করিতেছি না—যাহা প্রকৃত সত্য তাহাই বলিতেছি। তুমি যাঁহাকে

ভিক্ষুক ভাবিয়াছ, তিনি বাস্তবিক ভিক্ষুক নহেন—তিনি স্বয়ং ছদ্মবেশী সম্রাট্ আকবর সাহ—”

আকবর সাহের নাম উচ্চারিত হইবামাত্রই রঞ্জনলাল মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার প্রচুর স্বেদ নিঃসরণ হইতে লাগিল। মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল, খাদ্যপাত্র হস্তচ্যুত হইয়া হর্ম্ম্যতলে পড়িল। কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন, তাঁহার মনে এ সমস্ত রহস্য বলিয়া বোধ হইল—একবার তিনি প্রতাপের মুখের দিকে চাহিলেন। প্রতাপও তাঁহার ন্যায় নিশ্চল ও স্থির—তবে প্রতাপ সত্য কথাই বলিয়াছেন। কিন্তু প্রধান সন্দেহ এই—আকবর সাহ এখানে আসিবেন কেন?

প্রতাপ রঞ্জনের মনের ভাব মুখে দেখিতে পাইলেন। বলিলেন—“ভাই! ভাবিতেছ, আকবর সাহ এখানে আসিবেন কেন? আসিবার কারণ আছে। তুমি বোধ হয় জান, আমি বাদ

সাহের প্রধান চিত্রকর। বাদসাহের জীবনের প্রত্যেক সুখ ঐশ্বর্য্যের সময় তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহার সমস্ত অবস্থাই আমি চিত্রিত করিয়াছি। বাদসাহের সখ্ হইয়াছিল,—ভিক্ষুক-বেশে তাঁহাকে কিরূপ দেখায়, তাহার স্মৃতি রাখিবার জন্য। তাই তিনি আজ ভিক্ষুকবেশে আমার গৃহে আসিয়াছিলেন। কেবল আজ নয়—আজ তিন দিন এই ভাবে আসিতেছেন। ভিক্ষুকবেশ আমিই তাঁহার জন্য সংগ্রহ করিয়াছি। তোমার সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, সমস্তই তিনি আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন। তোমাকে একখানি পত্র দিয়াছেন, এই লও—"

রঞ্জনলাল পত্র পড়িবেন কি—তাঁহার তালু শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল, মস্তক ঘুরিতেছিল। তিনি স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, কি জাগ্রত সত্যে পরিবেষ্টিত ছিলেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না।

প্রকৃতিস্থ হইয়া রঞ্জনলাল বাদসাহের পত্র পাঠ করিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

মহানুভব বন্ধো!

আগামী কল্য রাত্রে, দরিদ্র ভিক্ষুকের কুটীরে পদার্পণ করিলে বড়ই প্রীত হইব। চিহ্নস্বরূপ এই অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া গেলাম। ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য, প্রতাপ বলিয়া দিবেন।

"জালাল উদ্দিন আকবর।"

এ কি প্রহেলিকা! না জাগ্রত স্বপ্ন! রঞ্জনলাল ভাবিতে লাগিলেন—"আগরার প্রকাণ্ড লোহিত প্রস্তরময় দুর্গই কি ফকিরের কুটীর!!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

তার পরদিন কাটিয়া গেল। সন্দেহে, বিস্ময়ে, আবেগে, উৎকণ্ঠায়, কৌতূহলে, রঞ্জনলাল সে দিন কাটাইলেন। সন্ধ্যার পর প্রতাপ

বলিলেন,—"রঞ্জন! বাদসাহের সহিত সাক্ষাতের জন্য যাত্রা কর, এই উপযুক্ত সময়। আমি তোমাকে দুর্গদ্বার পর্য্যন্ত রাখিয়া আসিব। দুর্গ-দ্বারে একজন তাতার-দেশীয় খোজা তোমার জন্য অপেক্ষা করিবে—এই অঙ্গুরীয়ক তাহাকে দেখা-ইলেই সে তোমাকে বাদসাহের নিকট লইয়া যাইবে। বাদসাহের এই নিদর্শন লও"—বলিয়া আকবর সাহের নামাঙ্কিত এক বহুমূল্য হীরকা-ঙ্গুরীয়ক তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই, প্রতাপের সহায়-তায় উপযুক্ত পরিচ্ছেদে সুসজ্জিত হইয়া, প্রতাপ ও রঞ্জন দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দুর্গদ্বারে এক তাতার-প্রহরী রঞ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতে-ছিল। দুইজন আগন্তুককে সম্মুখীন দেখিয়া বলিল—"নিদর্শন কই? একজনের বেশী প্রাসা-দের মধ্যে লইয়া যাইবার হুকুম নাই।"

প্রতাপ বলিলেন—"আমি যাইব না, ইনিই সঙ্গে যাইবেন।" প্রতাপ চলিয়া গেলেন।

রঞ্জনলাল দর্শন-দরওয়াজা দিয়া দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কি ভয়ানক উন্নততোরণ!! উপরে দেখিতে গেলে মাথা ঘুরিয়া যায়। তোরণের আদ্যোপান্ত লোহিত প্রস্তরখণ্ডে গ্রথিত। দ্বারে ভীমকায় প্রহরিগণ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে পাহারা দিতেছে। দরওয়াজার পর হইতে পথ ক্রমশঃ উচ্চ হইয়াছে। রঞ্জনলাল এই উচ্চপথ ধরিয়া কিয়দ্দূর অতিবাহিত করিয়া, আর এক প্রকাণ্ড সৌধের নিকট উপস্থিত হইলেন। সৌধের অতুল সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত ও নির্ব্বাক্। মহলের প্রবেশ-দ্বারে প্রহরী নিদর্শন চাহিল। তাতার প্রহরী অঙ্গুরীয়ক দেখাইলে, সে দ্বার ছাড়িয়া দিল।

রঞ্জন ভাবিলেন—"এ কি! কোথায় আসিলাম—এমন প্রকাণ্ড পুরী ত কোথাও দেখি নাই! শত শত খিলানে, সহস্র সহস্র স্তম্ভে—প্রাসাদের অতুল সৌন্দর্য্য। চারিদিকে সুগন্ধময় দীপাবলি জ্বলিতেছে। দালানের দুই পাশে—খিলানের

নিম্নে, নানাবিধ প্রস্তর-খচিত প্রতিমূর্ত্তি ভাস্করের কারু-কার্য্যের জীবন্ত দৃষ্টান্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রঞ্জনের মুগ্ধ ভাব দেখিয়া তাতার-প্রহরী বলিল—"এই মহলের নাম "যোধবাই-মহল"। বাদসাহের প্রধানা রাজ্ঞী যোধবাই—কুমার সেলিমের গর্ভধারিণী—এই প্রাসাদে বাস করেন। ইহা প্রাসাদের বহির্ব্বাটী।" কিয়দ্দূর আসিয়া প্রহরী বলিল—"মহাশয় দাঁড়ান।" রঞ্জন-লাল দাঁড়াইলেন। প্রহরী একখানি রেশমী রুমালে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আবদ্ধ করিল। রঞ্জন প্রাসাদের সৌন্দর্য্য দর্শনে বঞ্চিত হইলেন বলিয়া, বড়ই সংক্ষুব্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতক্ষণ এই-রূপ অন্ধের ন্যায় যাইতে হইবে?"

তাতারপ্রহরী হাসিয়া উত্তর করিল—"বাদ-সাহের হুকুম—এ মহলে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। কেবল আপনাকে অদ্যকার জন্য এই উপায়ে লইয়া যাইবার আদেশ হইয়াছে। এই মহল পার হইলেই আবার চক্ষু খুলিয়া দিব"।

রঞ্জনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহা ব্যতীত কি আর পথ নাই?"

"পথ থাকিবে না কেন—শত সহস্র। কিন্তু বাদসাহ সন্ধ্যার পর "দেওয়ানখাসে" অবস্থান করেন—তাই আপনাকে এই পথে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।" রঞ্জনলাল বিনা বাক্যব্যয়ে মহল পার হইলেন। মহল পার হইয়াই এক:প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ—প্রহরী সেইখানে তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিল।

রঞ্জনলাল দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব বিস্তৃত প্রাঙ্গণ—বোধ হয় তাহাতে দুই সহস্র লোকের সমাবেশ হইলেও স্থানের অকুলান হয় না। প্রাঙ্গণের চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লতাবিতান। লতাবিতানে শত সহস্র সুগন্ধি কুসুম ফুটিয়া চারিপার্শ্ব আমোদিত করিতেছে। মাঝে মাঝে মর্ম্মর প্রস্তরময় আসন—বিচিত্র রত্নবেদী। রত্নবেদীর আশে পাশে ছায়াময় ফল-ফুল-পূর্ণ বৃক্ষরাজি। তাহাদের শাখায় শাখায় পিঞ্জরাবদ্ধ শুক,

শারী, হীরামন প্রভৃতি পক্ষিগণ নিজ নিজ বুলি বলিতেছে—কোথাও বা কৃত্রিম পুষ্করিণীতে হংস, বক, সারস, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি জলবিহঙ্গগণ বিচরণ করিতেছে—কোথাও বা ময়ূরগণ শত শত চন্দ্রকখচিত পক্ষরাজি প্রসারিত করিয়া নৃত্য করিতেছে। ইহার মধ্যে একটি বৃক্ষের মূলভাগ সুন্দর মণিখচিত প্রস্তরে বেষ্টিত। তাহার উপর একখানি বিচিত্র আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের উপর কতকগুলি পণ্যজাত, ঈষৎ মলিন ও ধূলিমিশ্রিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে একখানি রত্নখচিত শিবিকা, আর সেই শিবিকার পার্শ্বে একটি উন্নত মর্ম্মর-প্রস্তরময় স্থানের উপর বাদসাহের পুরাতন উষ্ণীষ। সেই স্থানের চারিদিকে রৌপ্যপাত্রে সুগন্ধ দীপাবলি জ্বলিতেছে। বৃক্ষের আদ্যোপান্ত সুরভি কুসুম-মালায় বেষ্টিত হইয়া—সুগন্ধ মাখিয়া অতুল সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। চারিদিকে তাতার-রমণীগণ উন্মুক্ত অসি-হস্তে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতেছে।

রঞ্জনলাল সৌৎসুক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কি ? এখানে কি হইতেছে ?"

তাতার-প্রহরী বলিল—"মহাশয় ! এই বৃক্ষতলে 'খোসরোজের' দিন আকবর সাহের সহিত যোধপুর-রাজকুমারীর প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সে দিন রাজকুমারী যে শিবিকায় আসিয়াছিলেন, সেই শিবিকা ঐ রহিয়াছে। বৃক্ষতলে যে সমস্ত পণ্যজাত বহু মূল্য বস্ত্রখণ্ডের উপর সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে দেখিলেন, উহা সেই দিনেই বিক্রীত হইতে আসিয়াছিল। আর ঐ যে উষ্ণীষ দেখিতেছেন, উহা বাদসাহের। ঐ উষ্ণীষ আকবর সাহ যোধপুর-রাজকুমারীর অলক্তক-রঞ্জিত চরণতলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।"

রঞ্জনলাল এই সব দেখিতে দেখিতে প্রাঙ্গণ পার হইলেন। খোসরোজের দিন এই প্রাঙ্গণে কতই না সমারোহ হয় ! প্রাঙ্গণের পরই একটি ক্ষুদ্র ফটক দৃষ্ট হইল, প্রহরী রঞ্জনলালকে লইয়া সেই ফটকে প্রবেশ করিল।

ফটকের প্রথমটা বড় অন্ধকার। অন্ধকারে রঞ্জনের দুই একবার পদস্খলন হওয়াতে তাতার-প্রহরী তাঁহার হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহারা এক গৃহমধ্যে আলোক পাইলেন। এই স্থানে শাণিত বর্ষা-হস্তে বিশাল-দর্শন নপুংসকগণ প্রহরীর কার্য্য করিতেছে।

প্রহরী বাদসাহের নিদর্শন দেখাইয়া তাহাদের চুপি চুপি কি বলিল,—রঞ্জন তাহা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু বুঝিলেন তাঁহারই কথা হইতেছে। কথা শেষ হইবার পরই একজন প্রহরী আঙ্গরাখা হইতে স্বীয় রুমাল লইয়া তাঁহার চক্ষু বদ্ধ করিল, এবং একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া বলিল—"ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া উপবেশন করুন। কোনপ্রকারে ভয় পাইবেন না—বা নড়িবেন না। ভয় পাইবেন বলিয়া আমি চক্ষু বাঁধিয়া দিয়াছি।

রঞ্জন তাহার আদেশ ক্রমে সেই স্থানে বসিবামাত্রই আসনটি সহসা নড়িয়া উঠিল, ক্রমশঃ

ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। রঞ্জনলাল ঘোর অন্ধকার মধ্যে একবার চক্ষুর বাঁধন খুলিলেন, দেখিলেন সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকার!! তিনি অন্ধকারের মধ্য দিয়া দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছেন। উপরে অন্ধকার, নীচে অন্ধকার—চারিপার্শ্বে অন্ধকার। রঞ্জন ভাবিলেন, অন্ধকারেই সমাধি হইবে না কি? তিনি পুনরায় চক্ষু আবৃত করিলেন।

খানিক দূর উঠিয়া—গতি বন্ধ হইল। তীব্র আলোকচ্ছটা রঞ্জনলালের আবদ্ধ চক্ষুর মধ্য দিয়া চারিদিকে সঞ্চারিত হইল। তিনি দেখিলেন, একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কক্ষের চারিদিক্ দুগ্ধ-ফেন-নিভ মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা সমাবৃত। স্তম্ভ, খিলান, ছাদ সবই উজ্জ্বল মর্ম্মরময়। শত সহস্র আলোকচ্ছটা পতিত হইয়া কক্ষটি আরও মনোরম দেখাইতেছে। খিলান হইতে বড় বড় স্বর্ণমণ্ডিত দণ্ডে স্ফটিক দীপ-রাজি স্নিগ্ধভাবে চারিদিকে সুগন্ধ বিকিরণ করিয়া জ্বলিতেছে—গৃহের আশে পাশে চারিদিকে নানাবিধ

সুন্দর আলেখ্য। আলেখ্যের নিম্নে, স্তম্ভের গাত্র লোহিতবর্ণ রত্নরাজিখচিত মখমল দ্বারা মণ্ডিত—ভিত্তিমূল নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরের লতা পাতা ফল পত্রাদ্রিতে পরিশোভিত। স্তম্ভশিরে নাগকেশর, গন্ধরাজ, গোলাপ, চম্পক, যূথী, ও চন্দ্রমল্লিকার মালা দুলিতেছে। হর্ম্ম্যতল একখানি লোহিতবর্ণ বসোরার গালিচায় মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে। গৃহের চারিদিকে সুবৃহৎ মুকুর-রাজি। সেই সমস্ত মুকুরে, সেই কক্ষের প্রতি-বিম্ব পড়িয়াছে। হর্ম্ম্যের মধ্যস্থলে নানাবিধ বিচিত্র আসন ইতস্ততঃ বিন্যস্ত রহিয়াছে। আস-নের পার্শ্বে, লোহিত প্রস্তরময় উজ্জ্বল ফুলদানে ফুলের তোড়া। সকলের মধ্যে এক দ্যুতিময় রাজসিংহাসন। তাহাতে কত শত মণি মুক্তা জ্বলিতেছে !

রঞ্জনলাল এই সমস্ত দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দি-হান হইয়া উঠিলেন—ভাবিলেন, আমি কি স্বপ্ন

দেখিতেছি! একবার করদ্বয় দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক নিদ্রার ঘোর নয়। তবে কি মস্তিষ্কেরই বিকৃতি ঘটিল? না—সন্ধ্যার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে, সবই ত মনে পড়িতেছে।

রঞ্জনলাল ধীরে ধীরে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া এক গালিচার উপর দাঁড়াইলেন। কক্ষ নির্জ্জন—কেহই নাই। কেবল দীপের আলো! মুকুরে প্রতিফলিত, প্রতিবিম্ব—মণিমুক্তার ঝলসিত অঙ্গ-জ্যোতিঃ ভিন্ন আর কিছুই নাই। তিনি আর একটু অগ্রসর হইলেন, মুকুরে তাঁহার প্রতিবিম্ব পড়িল। একা রঞ্জনলাল আটটি হইয়া পড়িয়াছেন—ভাবিতেছেন কি করি, এমন সময়ে মুকুরে আর একটি প্রতিবিম্ব পড়িল। কি সর্ব্বনাশ! এ মূর্ত্তি যে তাঁহার পরিচিত। মূর্ত্তি দেখিয়া রঞ্জনলাল শিহরিয়া উঠিলেন। স্তম্ভিত হইয়া স্থির নেত্রে দেখিতে লাগিলেন, সেই মূর্ত্তি তাঁহার দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ধীরে

ধীরে নিকটে আসিয়া মূর্ত্তি স্থিরভাবে তাঁহার নিকটে দাঁড়াইল। বলিল—“বন্ধু! তুমি আসিয়াছ দেখিয়া বড় সুখী হইয়াছি। বোধ হয় আসিবার সময় কোন কষ্ট হয় নাই। যদি কিছু হইয়া থাকে তজ্জন্য কিছু মনে করিও না—”

রঞ্জনলাল ভাবিলেন এ স্বপ্ন নয়! এ যে কঠোর সত্য—সত্য অপেক্ষাও পরিস্ফুট। দিবা-লোকের ন্যায় সুস্পষ্ট এ মূর্ত্তি কার? এ যে সেই ভিক্ষুক-মূর্ত্তি!! প্রতাপের গৃহে আলেখ্য মধ্যে সে ভিক্ষুক চিত্রিত হইতেছিল, এ যে সেই ভিক্ষুক! ভিক্ষুক যে আর কেহই নহেন—স্বয়ং ভারতেশ্বর আকবর সাহ!

দর্পণে সেই ভিক্ষুক-মূর্ত্তি দেখিয়া রঞ্জন ভাবিতেছিলেন—ঐশ্বর্য্য যেন দারিদ্রের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। প্রমোদ-কানন যেন শ্মশানের ভাব ধরিয়াছে—তেজ যেন ধূমাচ্ছাদিত হই-য়াছে—দীর্ঘকায় পর্ব্বত যেন তুষারের মলিন আচ্ছাদনে ভূষিত হইয়াছে—সুখ যেন দুঃখকে

আলিঙ্গন করিয়াছে—প্রফুল্লতা যেন বিষাদকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে।

মূর্ত্তি আরও নিকটস্থ হইল। রঞ্জন আর থাকিতে পারিলেন না। নতজানু হইয়া, ঊর্দ্ধমুখে, যুক্তকরে বলিতে লাগিলেন—“সাহান্ সা! অধমের সহিত এ বিড়ম্বনা কেন? তুচ্ছাদপি তুচ্ছের সহিত এ কঠোর রহস্য কেন? দরিদ্রকে বন্ধু সম্বোধন কেন? না বুঝিতে পারিয়া যে দোষ করিয়াছি, তাহা কি হিন্দুস্থানের গৌরবস্বরূপ আকবর সাহের নিকট উপেক্ষণীয় নহে?”

“কে বলিল—আমি আকবর সাহ? হাঁ তবে আমি আকবরসাহকে চিনি বটে—তিনি আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয়। এখানে তিনি এখন উপস্থিত নাই। একটু পরেই এই গৃহে আসিবেন। আইস ভাই! তুমি এই আসনে উপবেশন কর।”

আবার ভ্রম! আবার বিস্মৃতি! আবার প্রহেলিকা! রঞ্জনলাল মহা সন্দেহে পড়িলেন। ভাবিলেন, তবে কি ভিক্ষুক আকবর সাহ নহেন—

প্রতাপ কি আমায় রহস্য করিয়াছে? রঞ্জন স্থির, নিস্তব্ধ, নির্ব্বাক্ হইয়া চিত্রপুত্তলীর ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। ভিক্ষুক ধীরে ধীরে প্রতাপের হস্ত ত্যাগ করিয়া আবার সেই দর্পণরাশির মধ্য দিয়া অপসৃত হইল।

সেই বিশাল, সুসজ্জিত, শিল্পখচিত, মখমল-মণ্ডিত, হিরণ্যময়-দীপালোকিত কক্ষে দাঁড়াইয়া একমাত্র রঞ্জনলাল—আর তাঁহার পার্শ্বে ঘোর নিস্তব্ধতা!! সহসা আর এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া ধীরে ধীরে দাঁড়াইল। তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না।

এবার ছিন্নকন্থার স্থান স্বর্ণ ও হীরক-খচিত বাসে পরিভূষিত, শূন্য মস্তকে দীপ্তিমান্ উষ্ণীষ, মলিন বস্ত্রাবৃত কটিদেশে মণিখচিত তরবারি, কর্ণে সুন্দর মুক্তাময় বীরবৌলি, মুখে তেজ, প্রতিভা, দীপ্তি, ঐশ্বর্য্য একাধারে বিরাজমান।

এবার এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তি সম্মুখীন হইয়া রঞ্জনলালের হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে এক আসনের

নিকট উপস্থিত হইল—তাঁহাকে উপবেশন করাইল—ধীরে ধীরে তাঁহার হাতের উপর হাত রাখিয়া বলিল—"রঞ্জনলাল! আর আমি তোমায় কুহেলিকাবৃত রাখিব না—আর তোমায় সন্দেহের কষ্ট দিব না; কিন্তু তোমায় আমার একটি অনুরোধ রাখিতে হইবে—আমি যাহা বলিব বা করিব, তাহা তোমায় বিনা বাক্য-ব্যয়ে পালন করিতে হইবে। তুমি অতি দরিদ্র ভাবিয়া যাহাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া-ছিলে, তাহাকে ধনী বলিয়া জানিতে পারিলেও, সেইরূপ স্বীকার করিতে হইবে। আমার পরি-চয় শুন,—আমার নামই জালাল উদ্দিন আক-বর। আমিই ভিক্ষুকবেশে চিত্রিত হইবার জন্য চিত্রকর প্রতাপের গৃহে গিয়াছিলাম, সেই খানেই তোমার অমূল্য বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি পাইয়াছি।"

"পরমেশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আমার ন্যায় অধমের প্রতি এই বিশাল হিন্দুস্থানের

শাসনভার ন্যস্ত করিয়াছেন। আমি হিন্দুস্থানের প্রজার অধীশ্বর নহি—বস্তুতঃ তাহাদের দাস মাত্র। দোষের দণ্ড দেওয়া আমার যেমন কর্ত্তব্য কার্য্য, গুণের উপযুক্ত পুরস্কার দানও তদ্রূপ কর্ত্তব্য। রঞ্জনলাল! পরমেশ্বর তোমায় অনেক অমানুষিক গুণাবলী দ্বারা শোভিত করিয়াছেন—তোমাতে যাহা আছে, হয় ত আমাতে তাহা নাই। আমি তোমার গুণের পুরস্কার করিব।”

“যাও—পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে তোমার জন্য লোক অপেক্ষা করিতেছে—সেখানকার কর্ত্তব্য তাহারাই বলিয়া দিবে।”

রঞ্জন মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাদসাহের আদেশ পালন করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে বহুমূল্য বেশ-ভূষায় ভূষিত হইয়া আসিয়া বাদসাহের পাদ-মূলে বসিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সম্রাট পুনরায় তাঁহাকে নিজের আসনে হাত ধরিয়া বসাইলেন। বাদসাহ আবার বলিতে লাগি-লেন—

"রঞ্জন! তোমার জীবনের সমস্ত ঘটনা আমি প্রতাপের মুখে শুনিয়াছি; তোমার আগরায় আসিবার কারণও শুনিয়াছি। যাহাকে তুমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছ, যাহার জন্য তুমি এই বিশাল সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছ, যাহার জন্য তোমার মনের সুখ গিয়াছে, তাহাকে তোমার সহিত আমি অগ্রে মিলিত করিব—তিলোত্তমার সহিত আমি তোমার বিবাহ দিব। ধনশ্রী আমার আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না—বরঞ্চ আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিবে। আর একটি কথা—আগরায় তোমার বিবাহ হইবে। আমি স্বয়ং সেই বিবাহ-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিব ও তোমায় যৌতুক দিব। ইহাতে অস্বীকৃত হইলে আমার মর্ম্মপীড়া হইবে। আমি আজ হইতে তোমাকে এক হাজারি মন্সবদারের পদে নিযুক্ত করিলাম। রাজা টোডরমল্ল কাল তোমার বাসায় নিয়োগপত্র পাঠাইয়া দিবেন।" কথা শেষ হইল। রঞ্জন

নিস্তব্ধ ও নির্ব্বাক্—কিন্তু তাঁহার হৃদয় কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। তাঁহার ন্যায় সামান্য দাসানুদাসের প্রতি বাদসাহের এত অনুগ্রহ, এই ভাবিয়া তিনি আকবরের উদারতায় বিস্মিত হইতে লাগিলেন।

বাদসাহ বলিলেন—"রঞ্জন! এই মণিহার আমি বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ তোমার গলদেশে অর্পণ করিলাম। ভরসা করি, এই সামান্য উপহার তুমি কখনও বিস্মৃত হইবে না"—বলিয়া বাদসাহ স্বহস্তে মণিময় হার তাঁহার গলদেশে শোভিত করিয়া দিলেন।

বাদসাহ আবার বলিলেন—"রঞ্জন, রাত্রি হইয়াছে, আজ এই পর্য্যন্ত। আবার সাক্ষাৎ হইবে। তুমি যে স্থান দিয়া আসিয়াছ, চল সেই খানে পৌঁছাইয়া দি—"

রঞ্জনলালের চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিতে লাগিল। আকবরের দেবতুল্য উদারতা দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত হইলেন। নতজানু

হইয়া বাদসাহের বস্ত্রপ্রান্ত চুম্বন করিলেন—তাঁহার মুখে কথা ফুটিল না।

বাদসাহ বলিলেন—"বন্ধো! তোমার দরিদ্র বন্ধু জালাল উদ্দিন তোমার স্মৃতি-পথ হইতে, তোমার সুখ দুঃখের মধ্যে কখনও যেন বহির্ভূত না হয়—এই তাহার শেষ অনুরোধ।"

বাদসাহ রঞ্জনকে সেই আসন দেখাইয়া দিলেন। রঞ্জন তাহাতে বসিবামাত্র, তিনি সহসা অদৃশ্য হইলেন এবং সেই উজ্জ্বল দীপাবলী সহসা নির্ব্বাপিত হইল। কক্ষের অন্ধকারের সহিত রঞ্জনের উজ্জ্বল স্বপ্ন আবার অন্ধকারে ডুবিল।

রঞ্জনলাল সেই দিন প্রভাতে প্রতাপের বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বাসায় আসিয়া প্রতাপকে সকল কথা বলিয়া রঞ্জনলাল হাঁফ ছাড়িলেন। সকল কথা

শুনিয়া, বন্ধুর এই অসম্ভাবনীয় অদৃষ্ট পরিবর্ত্তনে প্রতাপ অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। রঞ্জন-লাল মন্সবদার হইয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার আনন্দ-রাশি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

ঠিক মধ্যাহ্ন সময়ে বাদসাহের চারিজন অশ্বারোহী প্রতাপের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল। তাহাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"এখানে রঞ্জনলাল বলিয়া কোন ব্যক্তি আছেন কি না?" প্রতাপ ডাক শুনিয়া নীচে আসিলেন, তাহারা রক্তবর্ণ বস্ত্রমণ্ডিত কতকগুলি কাগজ তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। তিনি সেইগুলি লইয়া উপরে গেলেন, অশ্বারোহীরাও সেলাম জানাইয়া প্রস্থান করিল।

রক্তবর্ণ বস্ত্রাচ্ছাদনী খোলা হইল। তাহার ভিতর একখানি ফারমান ও অপরখানি আদেশ-পত্র। দুই খানিই আকবরের নামাঙ্কিত ও রাজা টোডরমল্লের সহি-সম্বলিত। তাহার মধ্য

হইতে একখানি পত্রও বাহির হইল, সেখানি এই—

১। সাহান সা, পরম গৌরবান্বিত হিন্দু-স্থানের জ্বলন্ত সূর্য্য স্বরূপ আকবর সাহের আদেশ-ক্রমে আমি আপনাকে জানাইতেছি, অদ্য হইতে আপনি বাদসাহের সরকারে তৃতীয় শ্রেণীর মন্সবদারের পদে নিযুক্ত হইলেন। বাদসাহ আপনার বাসের জন্য আগরার "সেলিম-বাগ" নামক উদ্যান-বাটী নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন।

২। এই পদের মর্য্যাদানুরূপ জায়গীর আপনি স্বদেশেই হউক, বা অন্য কোন স্থানেই হউক, ইচ্ছা করিলেই পাইবেন। জায়গীরের বার্ষিক আয় অর্দ্ধ লক্ষ টাকা। আপনার মতা-মত জানাইলে সরকার হইতে আমি আমিন পাঠাইয়া নিশানদিহী করিয়া দিব।

৩। সম্মানের চিহ্ন স্বরূপ বাদসাহ আপ-নাকে একপ্রস্থ বহুমূল্য পোষাক, একখানি

তরবারি ও একখানি ঝালরদার পাল্কী দিবেন। এই সমস্ত বস্তু আপনার বিবাহের পর প্রকাশ্য দরবারে আপনি পাইবেন।

৪। সরকারের মুকিম এলাহাবাদ ছত্র-পটি-নিবাসী ধনশ্রী শ্রেষ্ঠীর উপর সরকার হইতে হাজিরা পরওয়ানা গিয়াছে। সেই পরওয়ানানু-সারে ধনশ্রী দাস এই সপ্তাহের মধ্যেই আগ-রায় পৌঁছিবেন। তাহার পর সেলিমবাগে আপনার বিবাহ-উৎসব সম্পাদিত হইবে।

৫। আপনার বিবাহের দিন সরকার হইতে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দু আমীর ওমরাহ নিমন্ত্রিত হইবেন। অম্বররাজ মানসিংহ ও আমি উপস্থিত থাকিয়া সকল কার্য্য সম্পাদন করাইব এবং স্বয়ং বাদসাহ বরকর্ত্তার কার্য্য করিবেন।

৬। আপনাকে প্রকাশ্য দরবারে সনন্দ না দেওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন আপনার "আম-খাসে" উপস্থিত হইবার আবশ্যকতা নাই।

সহী—শ্রীতোডরমল্ল।

পত্রখানি পাঠ সমাপ্ত হইলে প্রতাপ রঞ্জ-নের গলা জড়াইয়া বলিলেন—"ভাই! সার্থক তুমি, ধন্য তোমার হৃদয়ের উদারতা, যথার্থ গুণের পুরস্কার তুমিই লাভ করিলে।" সেই রাত্রি দুই বন্ধুতে বড়ই সুখে কাটাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বাদসাহের পরওয়ানা পাইয়া ধনশ্রী তিলোত্তমাকে লইয়া আগরায় উপস্থিত হই-লেন। তিলোত্তমা আসিয়াছে শুনিয়া রঞ্জ-নের হৃদয় শতগুণ স্ফীত হইয়া উঠিল। সে দিন রাত্রে আনন্দে তাঁহার নিদ্রা হইল না।

বাদসাহের আদেশ ক্রমে বিবাহের দিন স্থিরীকৃত হইল। ধনশ্রী বাদসাহের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া প্রতাপের বাসায় রঞ্জনের সহিত দেখা করিলেন। ধনশ্রীর মুখে আর আনন্দ ধরে না, তিনি রঞ্জনের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া

বলিলেন—“বৎস! আমি তোমার প্রতি অতিশয় অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তুমি এরূপ ভাবিও না যে, তোমার ঐশ্বর্য্য হইয়াছে বলিয়া আমি তোমায় স্তোক-বাক্যে ভুলাইতে আসিয়াছি। তোমার আসার পর তিলোত্তমার দশা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। আমি যে কন্যাকে ফিরিয়া পাইব, এমত আশা আমার ছিল না। বাদসাহ না বলিলেও আমি তোমার সহিত কন্যার বিবাহ দিতাম। আমি তোমায় পুত্র-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছি—বোধ হয় আমার উপর তুমি এই কঠোর ব্যবহার জন্য কোনরূপ রুষ্ট হও নাই।”

রঞ্জনলাল তাঁহাকে আর বলিতে দিলেন না। ধনশ্রীর পদধারণ করিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

* * *

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে—সেলিমবাগে তাহার আয়োজন চলিয়াছে। শুভ দিন উপস্থিত

হইল, রঞ্জনলাল শুভক্ষণে শুভ মুহূর্ত্তে তিলোত্তমার সহিত মিলিত হইলেন।

সে মিলনের আনন্দ কেবল নব-পরিণীত দম্পতীই যে উপভোগ করিলেন, এমন নহে—স্বয়ং বাদসাহ সেই বিবাহে উপস্থিত হইয়া আনন্দে মাতিলেন এবং যৌতুক স্বরূপ বর-কন্যাকে নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিলেন।

বিবাহের উৎসব শেষ হইলে রঞ্জনলাল প্রকাশ্য দরবারে "মন্সবদারের" পদে অভিষিক্ত হইলেন। পরে বাদসাহের নিকট অনুমতি লইয়া কয়েক দিনের জন্য ধনশ্রী ও তিলোত্তমার সহিত আলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে—যমুনা-বক্ষস্থ তরঙ্গরাজিতে তাহার জ্যোতিঃ শত শত অয়স্কান্ত মণির ন্যায় খেলা করিতেছে। প্রস্তরময় সোপান-রাজি, বালুকাময় নদী-সৈকত, জ্যোৎস্নায় হাসিতেছে—মাঝে মাঝে এক একটী পাপিয়া

দিবাভ্রমে চীৎকার করিয়া উঠিতেছে—এমন সময়ে দুই জন সেই যমুনা-তীরস্থ সোপান-রাজিতে আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহাদের মুখে চন্দ্রের আলোক পড়িল। একজন অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"রঞ্জন! সেই এক দিন, আর এই এক দিন। সেই দিন বিরহের আর আজ মিলনের। সে দিন বিদায়ের—আজ আলিঙ্গনের। এই খানেই না আমরা সেই দিন দাঁড়াইয়াছিলাম? এই খানেই না তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে?"

"আবার তিলোত্তমে! আবার সেই কথা! ছি তুমি বড় নির্দ্দয়!" বলিয়া তিনি আনন্দাশ্রু-পূর্ণ নয়নে আদরের সহিত তিলোত্তমাকে আলিঙ্গন করিলেন। একটী চুম্বন সেই জ্যোৎস্নাতলে উদ্ভূত হইয়া তিলোত্তমার কুসুম-কোমল আরক্তিম গণ্ডদেশে লয় প্রাপ্ত হইল।

রুধিরোৎসব।

রুধিরোৎসব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দের বসন্তকালে বাঙ্গালার জমীদারদের মধ্যে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। সুলতান সাহ সুজা সম্রাট্ সাহাজাহানের দ্বিতীয় পুত্র, বাঙ্গালার প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহার মন্ত্রণাদাতারা সরকার

হইতে বাঙ্গালার জমীদারদের উপর এক রোব-কারী জারি করিয়াছেন—ইহাতেই যত বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছে। সুজার "রোবকারী" বা আদেশপত্র এই—

প্রথম—"সুবা বাঙ্গালার প্রধান প্রধান জমীদার ও সামন্ত-বর্গের প্রতি মহাপ্রতাপান্বিত দিল্লীশ্বরের ও ভারতের একমাত্র গৌরবান্বিত সম্রাটের মহিমান্বিত পুত্র, সুলতান সাহ সুজার এই আদেশ যে—সম্প্রতি বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়া সম্রাট তাঁহাকে বঙ্গদেশের অধীশ্বর করিয়া পাঠাইয়াছেন। সাহ সুজার ইচ্ছা যে, দেশের সমস্ত প্রধান প্রধান জমীদার-বর্গের ও সামন্তগণের সহিত সদ্ভাব বর্দ্ধন করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি পরোয়ানা জারি করিতেছেন যে, উক্ত জমীদার ও সামন্তবর্গ আগামী চৈত্র মাসের পূর্ণিমার দিনে—রাজমহলে তাঁহার বিস্তৃত দুর্গমধ্যে দিল্লীর সম্রাটদের প্রথানুমোদিত যে "খোস্‌রোজ" মহোৎসব হইবে, তাহাতে তাঁহাদের স্ব স্ব কন্যা, আত্মীয় ও স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া দিবেন।

দ্বিতীয়—"দিল্লীতে বা আগরাতে তাঁহার গৌরবান্বিত প্রপিতামহ, পিতামহ ও পিতা, যেরূপ এবং যে উদ্দেশ্যে এই প্রকার খোস্‌রোজ মহোৎসব করিয়া থাকেন—রাজমহলে তাহাই হইবে। যে সকল জমীদার ও সামন্তবর্গ—সম্রাটপুত্রের সহিত

সদ্ভাব রাখিতে বা দিল্লীশ্বরের প্রতি সম্মান দেখাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা উক্ত দিবসে অপরাহ্নের পূর্ব্বে রাজমহলের দুর্গে স্ব স্ব দুহিতা ও স্ত্রীগণকে প্রেরণ করিবেন। অন্যথাচরণে তাঁহাদিগকে সরকারের চিরপ্রচলিত গৌরবান্বিত প্রথার অবমাননাকারী বলিয়া গণ্য করা যাইবে। তাঁহারাও পরদিন খোস্‌রোজের দরবারে উপস্থিত থাকিয়া রাজপ্রসাদ লাভ করিবেন।

তৃতীয়—সর্ব্বশেষে এই লিখিত থাকে, যে প্রকার উৎসবে পরাক্রমশালী রাজপুত রাজন্যবর্গ ও সামন্তগণ স্ব স্ব দুহিতা, পুত্রবধূ ও স্ত্রীদিগকে প্রেরণ করিতে গৌরবান্বিত বোধ করিতেন, বাঙ্গালার জমীদারদের প্রতি সাহসুজা সেই সম্মান প্রদান করিয়া তাহাদিগকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিতে চাহেন।"

সরকারী পরোয়ানা এইরূপ,—কিন্তু বাঙ্গালার জমীদার ও সামন্তবর্গের মধ্যে কাহারও এইরূপে গৌরবান্বিত হইতে ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা রাজপুত রাজা ও সামন্তগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে রাজ-দরবারের চক্ষে অনেক হীন বোধ করিতেন। তাঁহাদের মনের ইচ্ছা—তাঁহারা যেমন নগণ্য হইয়া পড়িয়া আছেন, সেইরূপই থাকুন। উক্তরূপ উচ্চ সম্মানে তাঁহাদের স্পৃহা নাই।

সুজার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির কথাটা তখন দেশময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে। দিবারাত্র সুরূপা তন্বঙ্গী কামিনীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিলাস-সুখেই তাঁহার দিন কাটিয়া যায়। তাঁহার বিশ্বস্ত ও প্রিয় সহচর রৌসন খাঁ, মন্ত্রণায় তাঁহার দক্ষিণ হস্ত। রৌসন দিন দিন সুজার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহার বিলাসিতার পথ আরও প্রশস্ত সুখময় করিয়া দিতেছে। এই উপায়ে যুবরাজকে বাধ্য এবং ব্যস্ত রাখাতেই তাহার লাভ। সরল-হৃদয় সাহ সুজা রৌসনের অন্তরের কথা জানিবার কোন অবসরই পান নাই।

বিলাস বিভ্রমে, মদিরাময় বিলোল রমণী-কটাক্ষে—স্বর্ণপাত্র-পরিপূর্ণ সুগন্ধিত সেরাজীতে আর কলকণ্ঠী কামিনীর অমিয়-মাখা সঙ্গীত-কাকলীতে—সুজার মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ রৌসন তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছে—রাজপুতনা, ইরাণ, পারস্য, কাশ্মীর প্রদেশের রমণীবৃন্দের অপেক্ষা বঙ্গান্তঃপুরে শতগুণ

লাবণ্যবতী রমণীগণ বিরাজ করিতেছেন। ইহাতেই স্মুজার সম্ভোগ-আকাঙ্ক্ষা বিশেষরূপে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রায় সাতমাস হইল তিনি বঙ্গদেশে আসিয়াছেন—ইহার মধ্যে বাঙ্গালার কয়েকটি আশ্রয়হীনা সুন্দরী তাঁহার অন্তঃপুরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। তিনি যখন ঢাকায় ছিলেন, তখন রৌসনের পরামর্শে রঘুদেব ঘোষাল নামক এক ব্রাহ্মণের পরমা সুন্দরী কন্যাকে বেগম করিবেন বলিয়া হস্তগত করিয়াছিলেন! রঘুদেবের কন্যা বস্তুতঃ সুন্দরী। দশের মধ্যে সেরূপ একটা মেলে না—তাই যুবরাজ সাহ স্মুজা রঘুদেবের কন্যার রূপে উন্মত্ত হইয়া দিবারাত্র তাহার কাছে পড়িয়া থাকেন।

রৌসন ভাবিল—"এইবার ত বেশ উপযুক্ত অবসর। যুবরাজ বঙ্গীয় সুন্দরীর সৌন্দর্য্যরসাস্বাদে উন্মত্ত। কিছুদিন এই সব ব্যাপারে সুবাদারকে ব্যাপৃত রাখিতে পারিলে আমারই যথেষ্ট লাভ। লুটের পথ ত খোলাই আছে—

তাহা ছাড়া প্রকারান্তরে আমিই বাঙ্গালার হর্ত্তাকর্ত্তা হইয়া পড়িব। এ সুখ, এ ঐশ্বর্য্য, এ প্রলোভন কে কোথায় সহজে ছাড়িতে পারে?"

এত ভাবিয়াই রৌসন সুজাকে সহজে প্রলোভিত করিয়া "খোস্‌রোজের" পরামর্শ দিয়াছিল। সুজাকে উৎসন্নের পথে লইয়া যাইবার ইহাপেক্ষা আর সহজ উপায় কিছু নাই। কাজেই যোগাড় যন্ত্র করিয়া বাদ্‌শাহ-পুত্রকে মন্ত্রণা দিয়া সে এই 'খোস্‌রোজের' পরোয়ানা জারি করিয়াছিল।

খোস্‌রোজের মন্ত্রণার মূলে রৌসন দুইটী উদ্দেশ্য লুকায়িত রাখিয়াছিল। প্রথম—যদি কোন সুন্দরী সুজার কর-কবলিত হয়, তাহা হইলে জমীদারদের সহিত তাঁহার বিবাদ বাঁধিবে। কেহ সুবাদার হইয়া জন্মায় নাই, বা কেহ তাঁহার চিরদাসত্ব করিবার জন্য অঙ্গীকার-পত্র দেয় নাই।

বাঙ্গালার জমীদারদের নিকট যখন পরোয়ানা পৌঁছিল, তখন তাঁহারা সকলেই কিংকর্ত্তব্য-

বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বাদসাহের পুত্র ভবিষ্যতে বাদসাহও হইতে পারেন, তাঁহার আজ্ঞা তাঁহারা কোন্ সাহসে লঙ্ঘন করিবেন? অথচ মোগলের অন্তঃপুরে কুলকন্যা প্রেরণ অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। না হয় পাঠানই হইল—কিন্তু তাহার যে কি পরিণাম হইবে, তাহা কে বলিতে পারে? দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ কলুষিত-চরিত্র মদিরা-পায়ী যথেচ্ছাচারী সুজার অন্তঃপুরে প্রাণসম দুহিতা, প্রেমময়ী ভার্য্যা, স্নেহময়ী ভগিনী তাঁহারা কোন্ প্রাণে পাঠাইবেন?

সুজারও পরওয়ানা পৌঁছিল, এ দিকে জমীদারদের মধ্যে হুলস্থূল আরম্ভ হইল। ইনি উহাকে লেখেন—"উপায় কি—কি করিবে? কিরূপে জাতি সম্ভ্রম রক্ষা হইবে?" সকলেরই মুখে "কি উপায়! কি উপায়!" কিন্তু উপায় কি, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে বীরভূমির প্রবীণ জমীদার কিরণ-

চন্দ্র রায় সমস্ত প্রধান প্রধান জমীদারবর্গকে লিখিয়া পাঠাইলেন—"আসুন, আমরা সকলে ঢাকায় সমবেত হইয়া এ বিষয়ের একটা উপায় নির্দ্ধারণ করি।" সকলে সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে গোপন ভাবে ঢাকায় উপস্থিত হইলেন। মুন্সী যুগলকিশোর, সুজার দরবারের প্রধান হিন্দু কর্ম্মচারী। এ ব্যাপারে তাঁহারও সম্পূর্ণ বিপদ—তিনি কর্ম্মচারী হইলে কি হয়, তাঁহার দুহিতাও পরম রূপবতী। তাঁহার ভাগ্য অন্যান্য জমীদারদিগের সহিত সমসূত্রে আবদ্ধ। তাহার উপর সুজার প্রিয়তম রৌসন তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল তাঁহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার বলে রৌসন এপর্য্যন্ত কিছু করিয়া উঠিতে পারে নাই। নচেৎ এতদিনে হয় ত তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারের অন্ধতমসাবৃত কক্ষ আশ্রয় করিতে হইত!

বীরভূমের জমীদার, যুগলকিশোরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—"ভাই! তুমিও

পরওয়ানা পাইয়াছ। আমাদের যদিও নিস্তার আছে, তোমার ত কিছুতেই নাই। তুমি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারী—তোমার উপর যুবরাজের জবরদস্তি অধিক। কিন্তু তুমিই আমাদের মধ্যে পরামর্শ দানে শ্রেষ্ঠ। কি করিলে মান বাঁচে—বলিয়া দাও?"

যুগলকিশোরও সম্ভাবিত বিপদ-প্রতিকার চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন,—পর দিন রাত্রে তাঁহার নিভৃতকক্ষে বাঙ্গালার অন্যান্য জমীদার-দিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া গুপ্ত-দরবারে ইহার একটা উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাঠক! একবার ঢাকা ছাড়িয়া আমাদের সঙ্গে রাজধানী রাজমহলে চলুন। সুজার প্রাসাদে কি ঘটনা হইতেছে, একবার দেখিয়া আসি।

একটী গন্ধদীপোজ্জ্বলিত সুসজ্জিত মালিকা-সুবাসিত বিচিত্রকক্ষে সম্রাট্-পুত্র সাহসুজা, অলোকসামান্যা সুন্দরীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন। কেহ বা সুগন্ধি, তুষারাসিক্ত সিরাজী পাত্র-পরিপূর্ণ করিয়া, কজ্জল-রেখাঙ্কিত বিলোল কটাক্ষে হাবভাব দেখাইয়া, সুজার হস্তে দিতেছে—আর সেই পানপাত্র মুহূর্ত্তে নিঃশেষিত হইতেছে। কোন সুন্দরী বা মাঝে মাঝে কোকিল-কণ্ঠে এক একটী গীতের এক চরণ মাত্র ঝঙ্কার দিতেছেন। কেহ বা সুগ্রথিত পুষ্পমালা লইয়া বাদশাহ-পুত্রের গলদেশে দিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া তোষা-মোদে মন ভুলাইতেছেন! কেহ বা সুজার উচ্ছিষ্ট আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ অধরোষ্ঠচুম্বিত পাত্রাবশিষ্ট সিরাজী পান করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেছেন—কেহ বা কোমল বাহুলতা দ্বারা বঙ্গেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া অলসভাবে তাঁহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছেন।

সকলেই আমোদে উন্মত্ত। সকলেরই প্রাণ আনন্দ হিল্লোলে ধীরে দোলায়িত। সকলেরই হৃদয়ে সুখ-প্রস্রবণের পূর্ণোচ্ছ্বাস বহিতেছে। কিন্তু এই সৌন্দর্য্যের হাটে একটী সুন্দরী নীরবভাবে গৃহের এক সুদূর প্রান্তে সুজার দৃষ্টির বাহিরে বাহিরে বসিয়া—কুপিত বাঘিনীর ন্যায় তাঁহার প্রতি কটাক্ষপাত করিতেছে। এত কোলাহলের মধ্যে কেহ তাহার অস্তিত্ব জানিতে পারে নাই। তাহার মুখে ক্রোধ ও জিঘাংসার পরিস্ফুট ছায়া—অনেক কষ্টে অসামান্য কৌশলে প্রশমিত হইয়া, রহিয়াছে। তাহার মনে যেন কোন সুগভীর উদ্দেশ্য জাগিতেছিল—তাই সে সেই সুরঞ্জিত সুচিত্রিত সুবাসিত দীপোজ্জ্বলিত কক্ষের সুন্দরী-সমাজের সীমার বাহিরে বসিয়া, একটা মতলব আঁটিতেছিল।

যে সুন্দরীরা সাহজাদার চারিধার ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দিল্লী

আগরা হইতে তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কাশ্মিরী, ইরাণী ও হিন্দুস্থানী রমণীর ভাগই অধিক। ইঁহাদের অধিকাংশই মুসলমানী। একটী ক্ষুদ্রকায়া সৌন্দর্য্যশালিনী তাতার দেশীয় যুবতী বঙ্গেশ্বরের ক্রোড়প্রান্তে উপবিষ্টা ছিল। যেন সেই সৌন্দর্য্যের হাটে, সেই কেবল সাহাজাদার আদরের আদরিণী হইয়াছিল। সে হাসিয়া বলিল—"জাঁহাপনা! আমরা সকলে আছি, কিন্তু সেই বাঙ্গালী রমণী, আপনার আদরের রোসেনা কোথায়? তাহাকে আপনি অত ভালবাসেন—কিন্তু সে তাহার তিলমাত্র প্রতিদান করে না, বরঞ্চ প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা এত করিয়াও আপনার একবিন্দু অনুগ্রহ পাই না। সবই আমাদের অদৃষ্ট।"

কথা শেষ না হইতে হইতেই পূর্ব্বকথিত রমণী নিজ স্থান হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সসম্ভ্রমে সুজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—"জাহাপনা! কি হুকুম হয়? দাসী উপস্থিত

আছে। পাছে ইহাঁরা আমোদে কোন বিঘ্ন বোধ করেন, তাই আমি একটু দূরে বসিয়াছিলাম।”

যে ক্ষীণাঙ্গী তাতার যুবতী যুবরাজের নিকট সেই বঙ্গীয়া সুন্দরীর বিরুদ্ধে বলিতেছিল, এক্ষণে সহসা রোসেনাকে সম্মুখীন দেখিয়া সে যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া সরিয়া বসিল। সুজা বলি-লেন—“পিয়ারি! দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? আইস এখানে—আমার কাছে উপবেশন কর।”

তখন যেন সে মুখ হইতে বিষাদ চলিয়া গিয়াছে। ফুল্ল রক্ত-রাগরঞ্জিত সরস ওষ্ঠাধরে হাসির রাশি লইয়া সেই সুন্দরী অগত্যা তাঁহার হুকুম তামিল করিল। যুবরাজের ইচ্ছানু-সারে একপাত্র উষ্ণ সিরাজী তাঁহার মুখের কাছে ধরিল। যুবরাজ মদিরাপাত্র শেষ করিয়া জড়িত-স্বরে তাহাকে বলিলেন—“পিয়ারি! তুমি বড় সুন্দর! তোমার সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে বড়ই মধুর লাগিয়াছে—বাঙ্গালীর ঘরে যে এত দূর সুন্দরী থাকিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল

না। আমি—আমি—আমার হারেমের শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে পূর্ণ রাখিব। তুমি তাহাদের অধীশ্বরী হইবে! তোমায় দেখিয়া, আমার হারেমের সকলেরই সৌন্দর্য্য তিক্ত লাগিয়াছে।” বাদসাহের এই সোহাগে সুন্দরী-মণ্ডলীর হৃদয়ে তীব্র বিদ্যুতের জ্বালা ছুটিল। অনেকের প্রাণে ঈর্ষার দাবানল জ্বলিয়া উঠিল।

সেই অনুগৃহীতা সুন্দরী রোসেনা বলিল, “না জাঁহাপনা—আমি তাহাদের অধীশ্বরী হইতে চাহি না, চিরকাল আপনার চরণ সেবা করিব, ইহাই দাসীর জীবনের কামনা।”

“তবে সুন্দরি! এস সরিয়া এস—আমার হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। তুমি বাঙ্গালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী। সকল দেশের স্ত্রীলোকের সার সৌন্দর্য্য লইয়া খোদা বাঙ্গালা দেশের রমণী গড়িয়াছেন—এ কথা সত্য নয় কি?” সুজা এই কথা বলিয়া সেই প্রশংসা-গর্ব্বিতা রোসেনার সুকোমল উরসোপরি ঢলিয়া পড়িলেন।

রমণী বলিলেন, "জাঁহাপনা! দাসীর যেরূপ গৌরব বাড়াইলেন, তজ্জন্য সে অতি গৌরবান্বিত মনে করে। ভারতের ভাবী-সম্রাট সাহজাদা সাহ সুজার মুখের কথার মূল্য যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাও সে জানে। কিন্তু জাঁহাপনা! দাসী শতগুণে হীনা। যদি বীরভূমের জমীদার কিরণরায়ের পরমা সুন্দরী কন্যা কখনও জনাবের চক্ষুগোচর হইতেন, তাহা হইলে এই সুন্দরীকুল সৌন্দর্য্যের মহাসমুদ্রে তৃণোচ্ছ্বাসের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেন। যুবরাজ! কি লোকললাম সৌন্দর্য্য! কি তীব্রোজ্জ্বল রূপগরিমা! না—আমি তা বর্ণনা করিতে পারিব না—এই দেখুন তাঁহার চিত্র!"

তখনই সেই কোমলাঙ্গীর বস্ত্র মধ্য হইতে একখানি আলেখ্য ধীরে ধীরে সুজার সম্মুখে উন্মোচিত হইল! সাহ সুজা তাহার ক্রোড়ে শুইয়া অমরাবতীর সুখ উপভোগ করিতেছিলেন, কিন্তু চিত্রপট দেখিয়া সহসা শীকার-লোলুপ

ব্যাঘ্রবৎ উঠিয়া বসিলেন। চিত্রখানি তাঁহার চক্ষুর সহিত মিলিত হইবামাত্র, তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। সেই মনোহর চিত্রপট দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"না—না—এ প্রলোভন আমি একবার কাটাইয়াছি। শীঘ্র এই চিত্র ছিঁড়িয়া ফেল—আর আমি উহা দেখিতে চাহি না।"

বঙ্গেশ্বর কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে চিত্রপটপ্রদাত্রীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরে গম্ভীরকণ্ঠে তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী সুন্দরী-মণ্ডলীকে আদেশ করিলেন—"তোমরা সকলেই এ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। কেবল মাত্র এই রোসেনা আমার কাছে থাকিবেন।" অনেকে উৎকণ্ঠায় ও আগ্রহে সেই চিত্রপট দেখিতে আসিয়াছিল—সুজার নিষেধাজ্ঞায় সকলেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই উৎসবময়, দীপোজ্জ্বলিত, সুগন্ধিত কক্ষ নীরব হইয়া পড়িল। সুন্দরীগণ টলিতে টলিতে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কেবলমাত্র সাহ সুজা ও তাঁহার অনুগ্রহ-প্রফুল্লা রোসেনা কক্ষমধ্যে রহিলেন।

পাঠক! এই বঙ্গদেশীয়া রমণীকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? ইনিই সেই রঘুদেব ঘোষালের অপহৃতা, প্রলুব্ধা, কুলকলঙ্কিনী কন্যা রত্নময়ী। সাহ সুজা আদর করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন—রোসেনা বেগম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রত্নময়ীকে নির্জ্জনে পাইয়া সাহ সুজা উৎকণ্ঠিত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন—"রোসেনা! বল দেখি এ চিত্র কোথায় পাইলে?" এই প্রশ্নকালে কি জন্য জানি না—সুজার মস্তিষ্কে মদিরার তেজ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সহজ বুদ্ধি আসিয়া জমিতেছিল। সাহাজাদা যেন তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ।

রত্নময়ী বলিল—"জাঁহাপনা! আমার পিতার পূর্ব্ব বাসস্থান বীরভূমি। কিরণ রায়ের কন্যা

প্রভাবতী আমার—বাল্যসখী। দুইজনে সর্ব্বদা একত্রে কাল কাটাইতাম। আমাদের দুইজনের বড়ই প্রীতি ছিল। প্রভাবতীই আমাকে সখীত্বের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বরূপ এই চিত্র উপহার দিয়াছিল।”

সুজার চরিত্র সংসর্গদোষে কলুষিত হইলেও মন নিতান্ত অনুদার ছিল না। তিনি সহাস্যে বলিলেন—“তবে আমায় ইহা দেখাইলে কেন? সখীত্বের পবিত্র নিদর্শন আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়-লোলুপকে দেখাইয়া অপবিত্র করিলে কেন? প্রভার সখী হইয়া শত্রুর কার্য্য করিলে কেন?”

“শত্রুর কাজ করিয়াছি! না—জাঁহাপনা! দাসী বাঁদীমাত্র! জনাবের সুখ সম্ভোগের দিকে কেবল তাহার লক্ষ্য। আজ আমার রূপ যৌবন আছে, তাই আপনার অনুগ্রহ—কিন্তু চিরকাল ত এ ছার রূপ থাকিবে না, তখন কি হইবে? তাই মনে ভাবিয়াছি—যাহাতে দাসী বাদসাহের চির-অনুগ্রহ পায়, তাহারই উপায় করিব। আমি

কিরণ রায়ের পরম রূপবতী কন্যাকে আপনার অঙ্কে তুলিয়া দিব।”

সুজার হৃদয়ে উদারতা বলিয়া একটা জিনিস ছিল। রোসেনার কথায় তিনি বিস্মিতচিত্তে বলিলেন—“রৌশন্ বল কি ? না না—তুমি বোধ হয় আমার সহিত রহস্য করিতেছ—? সাহজাহান বাদসাহের পুত্র এরূপ রহস্য পসন্দ করেন না।”

“না—যুবরাজ! আপনার সহিত রহস্য করে দাসীর এ স্পর্দ্ধা নাই। তবে নিতান্ত চরণাশ্রিতা অনুগৃহীতা বলিয়াই এরূপ বলিতে সাহসী হইয়াছি। আপনাকে তাহার প্রতি আসক্ত করিব বলিয়াই, এই চিত্রপট আনিয়াছি। যদি যুবরাজের ইচ্ছা হয়, তবে তাহাকে খোস্‌রোজের পরই আপনার অন্তঃপুরচারিণী করিব।”

“বটে—বটে—কিন্তু রৌসন্‌জান—তুমি যে তোমার সখীর এত সহজে সর্ব্বনাশ করিবে—ইহা ত আমার বোধ হয় না।”

“সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ কিসের যুবরাজ?

যিনি আজ বাদে কাল সমস্ত হিন্দুস্থানের অধিপতি হইবেন, তাঁহার অঙ্কলক্ষ্মী হওয়া যদি সর্ব্বনাশ হয়, তাহা হইলে দুঃখের এ দুনিয়ায় আর সুখ কিসে? বাদসাহের পুত্রগণের সহিত যে সম্পর্ক স্থাপনে অম্বর, মারওয়ার, যশলমীয়ার, বিকানীর চরিতার্থ বোধ করে—সামান্য বাঙ্গালী জমীদার কিরণরায় কি তাহাতে আপনাকে মহা সৌভাগ্যবান্ বোধ করিবেন না?" সুজার চিত্ত এই প্রকার চাটুবাদে আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—সেই স্বাভাবিক উদারতার পরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়লোলুপতার কালচ্ছায়া আবার সে বিবেক-পবিত্র হৃদয় কলঙ্কিত করিল।

সুজা সহাস্যে বলিলেন—"যা বলিতেছ—তা সত্য রৌশন্। কিন্তু প্রিয়তমে! দেখ, আমি এ কিশোরীকে পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আমি দুর্ব্বৃত্ত কিরণরায়কে বিশেষ জানি। যখন আমি ঢাকায় ছিলাম, তখন কোন বিশেষ কারণে কিরণকে সপরিবারে রাজধানীতে নজরবন্দী করিয়া রাখি-

য়াছিলাম। সেই সময়ে গবাক্ষপথে আমি তাহার কন্যাকে প্রথম দেখি। এখন সে কতই না রূপসী হইয়াছে! সেই প্রভাত-কমলবৎ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্য নবীন যৌবনে কতই মোহিনীরূপে না জানি ফুটিয়া উঠিয়াছে! তখন কোন বিশেষ কারণে আমাকে তাহার আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই চিত্রপট আবার আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে! রৌসন্! প্রিয়তমে! আমায় রক্ষা কর। ইহার জন্য যাহা কিছু করিতে হয়, সকলেই আমি প্রস্তুত—তুমি আমার মনস্কামনা পূর্ণ কর। সাহসুজার প্রীতিতে এই বাঙ্গলা একদিনে উৎসবক্ষেত্র হইতেও পারে, আবার বিরাগে দারুণ দাবানল জ্বলিতেও পারে!"

কুটিলা রোসেনা একটু ভাবিয়া বলিল,—"জাঁহাপনা! আর এক পক্ষ অপেক্ষা করুন—আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। আমি যে এপ্রকার অবস্থায় এখানে আছি, তাহা সে জানে না।

"খোসরোজের" দিন অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের ন্যায় নিশ্চয়ই তাহাকে এখানে আসিতে হইবে। কিরণরায় বিষয়ী, বুদ্ধিমান হইলেও বড় ভীরু। সে পরওয়ানা পাইলে সাহাজাদার আজ্ঞা কখন লঙ্ঘন করিতে সাহস করিবে না। প্রভাবতী যদি আমায় দেখিতে পায়, হয়ত ভাবিবে তাহার ন্যায় আমিও এখানে খোসরোজ দেখিতে আসিয়াছি। তার পর যাহা করিতে হয় আমি করিব।"

সুবিধা, সুযোগ, সহায়তা, সুজার হৃদয়কে বিশেষ প্রলুব্ধ করিল। তিনি আর এক পাত্র উষ্ণ-সিরাজী পান করিয়া ধীরে ধীরে সেইখানে শুইয়া পড়িলেন। গৃহ-মধ্যস্থ দীপাবলী অধিকাংশই নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সরস, পুষ্পমালিকার আকুলিত উন্মাদন সুগন্ধে, মদিরোন্মত্ত সুজা শীঘ্রই নিদ্রার ক্রোড়ে শুইয়া ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন—একটী লোহিত প্রস্তরময় দীপ্তিমান কক্ষে স্তম্ভে স্তম্ভে, ভিত্তিতে ভিত্তিতে ফুলের মালা

দুলিতেছে। তাহার মধ্যে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী ললনাগণ ফুলের মালা হাতে করিয়া একখানি হৈম-সিংহাসন বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গৃহমধ্যে মৃদঙ্গ, রবাব, বীণা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। হৈম-সিংহাসনে এক অতুলনীয়া সুন্দরী। সুজা যেন সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন—সুন্দরীগণ সম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। সেই সিংহাসনোপবিষ্টা অনিন্দ্য অপ্সরী-মূর্ত্তি, ধীরে ধীরে তাঁহার হাতখানি ধরিয়া সিংহাসনে বসাইল। সেই রত্ন সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার গলদেশে অতিশুভ্র মালতী মালা অর্পণ করিল। মালিকার সুবাস, বসন্তের মলয়া, আর সেই অলোক-সামান্যা রূপসীর রূপজ্যোতি! সুজা ভাবিলেন—তিনি যেন কোন কুহেলিকাময় স্বপ্নরাজ্যে, অপ্সরীদিগের কর-কবলিত হইয়াছেন। যে তাঁহার গলায় মালা দিয়াছিল—সে যেন হাসিয়া বলিল—"ছি! নিষ্ঠুর! তোমার জন্য আমি উন্মাদিনী। এই কি তোমার প্রেমের

মূল্য ! ভালবাসার মূল্য—ছি ! আমি অপ্সরারাণী তোমায় সাধিতেছি—ছি! তুমি! সুজা বিস্ময়োৎ-ফুল্লনেত্রে দেখিলেন, সেই অপ্সরারাণী আর কেহই নহেন—জমীদার কিরণরায়ের অলোক-সামান্যা, রূপোজ্জ্বলিতা কন্যা—“প্রভাবতী” ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে রাজমহলের প্রস্তরময় দুর্গমধ্যে দীপাবলি-উজ্জ্বলিত রত্নখচিত কক্ষে, পূর্ব্ব পরি-চ্ছেদোল্লিখিত ঘটনাবলীর অভিনয় হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, ঢাকার ফৌজদার যুগলকিশো-রের অন্ধকারময় ভবনের এক নিভৃত কক্ষে আর এক গোপনীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইয়া-ছিল। কক্ষটী সুসজ্জিত হইলেও ক্ষুদ্র বর্ত্তিকার মলিন আলোক-ছটায় তাহার সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নয়নগোচর হইতেছিল না। হর্ম্ম্যতলে এক বিস্তৃত গালিচার উপর উপবেশন করিয়া, বাঙ্গা-

লার আটজন ক্ষুদ্র দিক্‌পাল—নিভৃতে এক গূঢ় মন্ত্রণায় ব্যস্ত ছিলেন।

কক্ষমধ্যে সকলেই মলিন মুখে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া আছেন—সকলেরই মুখ প্রফুল্লতাহীন ও ঘোর চিন্তারেখাঙ্কিত। সকল মুখেই বিপদাশঙ্কা-জনিত—কালছায়া ও ঘোর বিষণ্ণতা, মহাঝটিকার পূর্ব্বে যেমন সমগ্র বিরাট প্রকৃতি স্থির ভাব ধারণ করে, তাঁহারা সকলে মুখোমুখী হইয়া সেইরূপ স্থিরভাবে উপবিষ্ট।

গভীর নিশীথ। চরাচর সুপ্ত। সমস্ত প্রকৃতি অন্ধকারতলে নীরবে বিশ্রাম করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নৈশ-পবনের সন্ সন্ শব্দ আর পথিপার্শ্বস্থ সারমেয়ের চীৎকার ধ্বনি সেই গভীর নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। অদূরস্থিত ঘন পল্লবময় বৃক্ষ-শাখোপবিষ্ট পেচকের গভীর কণ্ঠস্বর আবার তাহার সহায়তা করিতেছিল।

যুগলকিশোর সর্ব্বপ্রথমে সেই নির্জ্জন কক্ষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন। তিনি বাদ-

সাহের ফৌজদার। বঙ্গেশ্বর সুজার অধীনস্থ হইলে কি হয়, দিল্লীর সরকার হইতে তিনি নিয়োজিত হইয়াছেন। তাঁহার সাহসও যথেষ্ট। তিনি গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"আপনারা কি স্থির করিলেন, জানিতে ইচ্ছা করি।"

এক জন জমীদার উত্তর করিলেন—"আমার মতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া আমাদের স্ত্রী কন্যাকে না পাঠানই ভাল। যখন উভয় দিকে শোচনীয় পরিণাম, তখন প্রথমটী অপেক্ষা শেষটাই আমাদের ঘটুক।"

আর এক জন বলিলেন—"মুখের কথা ও কাজের কথায় অনেক প্রভেদ। অনুমান ও প্রত্যক্ষ কার্য্যকাল এই উভয়ের মধ্যে বিভিন্নতা অনেক। খোস্‌রোজে কন্যাপ্রেরণ না করিলে যেরূপ শোচনীয় পরিণাম হইবে আপনি অনুমান কবিতেছেন, প্রকৃত কার্য্যকালে সেটা ভয়ঙ্কর হইতে পারে। বিশেষতঃ সুজা প্রথম স্থলে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট করিতে পারেন? তাঁহার

এতদূর সাহস হইবে না যে, তিনি ভদ্র মহিলা-গণকে কবলে পাইয়া কোন প্রকার অবমাননা করেন। দৈবের উপর নির্ভর করিয়া সকলকে পাঠান যাক্, পরিণাম যাহা হয় হইবে। এ ক্ষেত্রে দৈবই রক্ষা করিবেন।”

আর এক জন বলিলেন—“দৈব পুরুষ-কারের বিরোধী। দেবতা, রক্ষার ভার মানবের নিজের হাতেই দিয়াছেন। মানব কেবল দৈবের সহায়তা গ্রহণ করে মাত্র। মানব যদি ইচ্ছা করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনে, তাহা হইলে দৈব কিছুতেই রক্ষা করিতে পারেন না।”

আর এক জন বলিলেন—“এক কাজ করা যাক্। কতকগুলি সুন্দরী স্বৈরিণী সংগ্রহ করিয়া প্রচুর অর্থ দিয়া কুলকন্যা বলিয়া পরিচয় দিয়া তাহাদের উৎসবক্ষেত্রে পাঠান হউক। তাহারা স্বভাবসিদ্ধ চতুরতা ও হাবভাবে সুজাকে অনা-য়াসে প্রতারিত করিয়া আসিবে এবং আমাদেরও কুলমান রক্ষা হইবে।”

আর এক জন বলিলেন—“সরল ভাবে কার্য্য করিলে বোধ হয়, সাহ সুজা কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না—তিনি যে সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব বর্জ্জিত এমত নহে। তাঁহার হৃদয়ে উদারতা বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু এ প্রকারে প্রতারণা করিলে যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে প্রলয়াগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। আর সেই অগ্নিতে বাঙ্গালার সমস্ত জমীদারগণ ভস্মীভূত হইবেন।”

বীরভূমির জমীদার—কিরণরায় মহাশয় চুপ করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত কোন কথাই কহেন নাই। তিনি বলিলেন,—“এখনও ত সময় আছে। আমার মতে এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিয়া সওয়ার ডাকে, বৃদ্ধ বাদসাহের নিকট দিল্লীতে আবেদনপত্র সমেত উকীল পাঠান হউক, এবং সঙ্গে সঙ্গে সুজাকে কোন বিশেষ ওজর দেখাইয়া উৎসব কার্য্য আপাততঃ বন্ধ রাখান হউক।”

কিন্তু, পক্ককেশ যুগলকিশোর সকলেরই যুক্তি শুনিলেন এবং পরিশেষে হাস্য করিয়া কহিলেন—"মহাশয়গণ! আপনাদের সকলকার যুক্তিই শুনিলাম। কিন্তু আমার মতে সুজার দরবারে সকলেরই স্ত্রী কন্যা পাঠান উচিত। রাজমহলে তাহাদের ত একাকী পাঠান হইতেছে না। আমরা ত সকলেই দলবলে যাইতেছি। সাহ সুজা যে জমীদারবর্গকে একবারে ভয় করিয়া চলেন না—তাহাও নহে। বিশেষতঃ ন্যায়পরায়ণ বাদসাহ সাহজাহান যতদিন সিংহাসনে বিরাজমান—ততদিন সাহজাদা ইচ্ছা থাকিলেও কাহারও উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না। এই উৎসবকার্য্যে এখন বাধা দিলে আমাদের হয়ত বাদসাহের কোপমুখে পড়িতে হইবে। কিন্তু এ কার্য্যে সম্মতি দিলে তাহার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ দিল্লীর রাজনৈতিক আকাশ ভয়ানক মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে বাদ-সাহের সঙ্কট পীড়াদি উপস্থিত হওয়াতে দিল্লীর

সিংহাসন লইয়া কুমারগণের মধ্যে মহা হুলস্থূল উপস্থিত হইতেছে। এ সময়ে গর্হিত ব্যবহার করিলে সুজার স্বার্থে ব্যাঘাত ও অনিষ্ট বই ইষ্টসাধন হইবে না। এ ক্ষেত্রে আমাদের দৈবের উপর নির্ভর করিয়া স্ত্রী কন্যা পাঠান উচিত।”

যুগলকিশোর নিস্তব্ধ হইলে অন্যান্য সকলে স্থিরভাবে তাঁহার কথা আলোচনা করিয়া বলিলেন—“আপনার যুক্তিই আমাদের গ্রহণীয়।”

কিন্তু কিরণরায় সর্ব্বশেষে গম্ভীর অথচ কম্পিত স্বরে বলিলেন—“আমার মত আপনাদের হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আপনারা যাহা করিতে হয় করুন, আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমার পরিবারবর্গের কাহাকেও আমি রাজমহলে যাইতে দিব না। ইহাতে পরিণাম যাহা হয় হউক, আমি তাহার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

যদি সেই সময়ে সহসা বজ্র পতন হইত, তাহা হইলেও গৃহস্থিত সকলে ততদূর চম-

কিত হইতেন না। বৃদ্ধ কিরণরায়ের ভীরুতা অপবাদ লইয়া সকলেই কাণাকাণি করিত। সকলেই এখন দেখিলেন, কিরণরায়ের সাহস তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক অধিক। যিনি সুবাদারের প্রধান কর্ম্মচারীর সম্মুখে এরূপ স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে পারেন, তাহার পরিণাম জানিয়া শঙ্কিত নহেন, তাঁহার অনেক সাহস।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কিরণচন্দ্র রায় মহাশয় উত্তেজিত ভাবে সেই গভীর রাত্রেই তাঁহার ঢাকার বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন। ঢাকা রাজধানী, কাজেই ঢাকায় তাঁহার বাড়ীঘর ছিল। সুজার উৎপীড়নে তিনি পূর্ব্বে একবার ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এক্ষণে সুজা আর ঢাকায় থাকেন না—সুতরাং বীরভূমি ত্যাগ করিয়া তিনি সেই খানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেছিলেন।

রজনীর দ্বিযাম অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—এমন সময়ে কিরণরায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। বাহ্য জগতের অন্ধকারের ছায়া তাঁহার ভবিষ্যতের উপর পড়িয়াছিল, তিনি ভাবিতে ভাবিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া একটী কক্ষে করাঘাত করিয়া ডাকিলেন—"মা প্রভা! তুই কি এখনও ঘুমাস্‌নি—আমার জন্য জাগিয়া আছিস্?"

প্রভা পিতার স্বর শুনিয়া, সানন্দে দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল—"বাবা! আমি এখনও ঘুমাই নাই—তোমাদের মন্ত্রণার কি হইল শুনিব বলিয়া, এখনও বসিয়া আছি। হাঁ বাবা—সকলের পরামর্শে কি স্থির হইল?"

প্রভার একটু পরিচয় আবশ্যক। প্রভা কিরণচন্দ্র রায় জমীদার মহাশয়ের একমাত্র সন্তান—অতুল বিষয়ের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। প্রভার জন্মের পূর্ব্বে তাহার দুইটী ভাই

হইয়াছিল, তাহারা একটী আট বৎসরের ও অপরটী দশ বৎসরের হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

প্রভা মাতৃহীনা—ভ্রাতাদের মৃত্যুর পরই তাহার মাতা রুগ্না হইয়া পড়েন এবং তাহা-তেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময় প্রভার বয়স তিন বৎসর। তাহার এক মাতৃ-ষ্বসা কিরণরায়ের গৃহে বাস করিয়া সেই মাতৃ-হীনা বালিকার লালন পালন করেন।

প্রভা সকল সৌন্দর্য্যের আধার! সে রূপরাশি পরিস্ফুট করিতে সুনিপুণ চিত্রকরের তূলিকাও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে। তাহার প্রশান্ত কমনীয় মুখে প্রভাত-কমলের নির্ম্মল সৌন্দর্য্য ফুটিয়া রহিয়াছে। পবিত্রতা সে মুখে আরও শুভ্রতর হইয়া বিরাজ করিতেছে। সে হৃদয়ে স্নেহ, দয়া, মমতা, সর্ব্বজীবে সমভাব, আত্মসম্মান বোধ, সকলই যেন পাশাপাশি হইয়া অবস্থান করিতেছিল। বিধাতা বাহ্য ও আভ্য-ন্তরীণ সৌন্দর্য্যের চরমোৎকর্ষ দেখাইবার জন্যই

যেন নির্জ্জনে বসিয়া সুন্দরী প্রভার সৃষ্টি করিয়াছেন!

প্রভা বাল্যকাল হইতে মাতৃহীনা—সুতরাং পিতার অতিশয় স্নেহের পাত্রী। তাহার বয়স এক্ষণে চতুর্দ্দশ বৎসর। বাঙ্গালীর ঘরে সেকালে এতবড় মেয়ে রাখা অসম্ভব ব্যাপার—কিন্তু উপায় না থাকিলে কি হইবে? কিরণরায় গৃহ-জামাতার পক্ষপাতী—কিন্তু এ পর্য্যন্ত একটী পাত্রও তাঁহার পসন্দ হয় নাই। কাজেই প্রভার বিবাহে এত বিলম্ব। এক-মাত্র স্নেহময়ী কন্যাকে চক্ষের অন্তরাল করিতে তিনি নিতান্তই অনিচ্ছুক।

সেই স্নেহময়ী বালিকা পিতার জন্য সযত্নে নানাবিধ রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যাদি সাজাইয়া রাখিয়াছিল। প্রভা কাছে বসিয়া না খাওয়াইলে রায় মহাশয়ের আহার হইত না। তিনি আহারে বসিলেন, প্রভা একখানি ব্যজনী লইয়া পিতাকে ব্যজন করিতে লাগিল।

যাহার হৃদয়ে দারুণ দুশ্চিন্তা, তাহার মুখে আহার রুচিবে কেন? কিরণরায়ের পাত্রস্থ আহার্য্য-দ্রব্য সেইরূপই রহিল। তিনি আচমন করিয়া উঠিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ আরম্ভ করিলেন। প্রভা বলিল—"বাবা! আমি ক্ষুদ্র বালিকা হইলেও দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, দারুণ দুশ্চিন্তা তোমার মনে জাগরূক, এই চিন্তা যদি অদ্যকার ঘটনা-সম্ভূত হয়—তাহা হইলে আমি তাহার প্রতিকার করিব।"

"তুমি তাহার প্রতিকার করিবে কি করিয়া মা? ক্ষুদ্র বালিকার এমন কি ক্ষমতা যে, সে পিতার দারুণ চিন্তার অপনয়ন করিতে পারে? মা—তোর জন্যই আমার ভাবনা!"

"বাবা! তুমি মন্ত্রণাস্থলে যাইবার পূর্ব্বেই আমি উপায় স্থির করিয়া রাখিয়াছি। আমি বুদ্ধিহীনা, কিন্তু মন্ত্রণায় কি স্থির হইবে, আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। বাবা, আমি তোমারি কন্যা, তোমার মনের ভাব আমি বেশ জানি।"

"আচ্ছা বল দেখি প্রভা! আমাদের কি মন্ত্রণা স্থির হইয়াছে?"

"সকলেই বাদসাহের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছে—কেবল তুমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছ।"

কিরণরায় প্রভাবতীকে তাঁহাদের মন্ত্রণীয় কথা এ পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই—সুতরাং প্রভার তীক্ষ্ণ প্রতিভায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন, বালিকা কি অমানুষী শক্তিসম্পন্না? কন্যা পিতার মনের ভাব বুঝিয়া ধীরে ধীরে কোমলকণ্ঠে বলিল—"পিতঃ! আমি অতি তুচ্ছ—এই মেদ-মাংসময় দেহ তোমা হইতেই উৎপন্ন—আমি তোমা অপেক্ষা কোন বিষয় ভাল করিয়া বুঝিবার কোন স্পর্দ্ধা রাখি না। কিন্তু নিশ্চয় জানিও পিতঃ! সুজার প্রস্তাবে সম্মত না হইলে ঘোর বিপদ! যে বিপদের জন্য তুমি এত চিন্তিত হইয়াছ, তাহা আপনি আসিয়াই উপস্থিত হইবে। বাবা! আমার কথা শুন, তোমার স্নেহময়ী প্রাণোপমা

কন্যার কথা শুন—আমাকে সুজার দরবারে পাঠাইয়া দাও। সকলে যখন যাইতেছে, আমি না যাইব কেন? তার পর সেখানে গিয়া যাহা করিবার তাহা করিব—যদি এ উৎসব-অনুষ্ঠানে অত্যাচারই সাহ সুজার ঈপ্সিত হয়, তাহা হইলে আমি এমন কিছু করিব, যাহাতে চিরকালের জন্য এ প্রকার অত্যাচারের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।"

কিরণরায় নিস্তব্ধে কন্যার কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাহার শেষাংশের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না। ধীর ভাবে বলিলেন,—"প্রভা! তোমার উদ্দেশ্য কি, কিছুই বুঝিলাম না। আমি যাহা হইতে তোমাকে নিবৃত্ত করিতে যাইতেছি, তুমি তাহাতেই প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত! তুমি বালিকা, সংসার-জ্ঞানানভিজ্ঞা, বোধশূন্যা। 'পিতার স্নেহময় ক্রোড় আর উচ্ছৃঙ্খল সাহাজাদার অন্তঃপুর—দুইটী বিভিন্ন ক্ষেত্র। তুমি বালিকা-হৃদয়ের উত্তেজনা-বশে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ।"

"না পিতঃ! উত্তেজনা নয়—সকল কথা না বলিলে তুমি বুঝিতে পারিবে না। সুজার মৃত্যুবাণ আমার হাতে রহিয়াছে। বাবা! তুমি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি ভুলি নাই। পিতঃ! দুই বৎসর পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিয়া দেখ। দুর্ব্বৃত্ত সুজা তোমাকে সপরিবারে ডাকিয়া লইয়া গিয়া একবার নজর-বন্দী করেন। প্রথমে আমি তোমার কাছে ছিলাম। সুজা আমায় একদিন অলিন্দে দেখিয়া, আমাকে তাঁহার নিজ গৃহের পার্শ্বে এক ক্ষুদ্র সুসজ্জিত কক্ষে অবরোধ করিয়া রাখেন। সেই সময়ে একদিন গভীর নিশীথে সেই পিতৃদ্রোহী সম্রাটপুত্র যে ভয়ানক মন্ত্রণায় তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সহিত লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত আমি জানি। সম্রাট সাহাজাহানের সেই সময়ে কঠিন পীড়া। সুজা সম্রাটের সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় স্বীয় ভ্রাতৃগণকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়া সম্রাটকে বিষ খাওয়াইবার মন্ত্রণা করেন। সাহসুজা

এ সম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা আরঞ্জীবকে ও প্রধান প্রণিধি মওয়াজি খাঁকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা আমারই হাতে পড়িয়াছে। পত্রখানি নানা কারণে সেই সময়ে দিল্লীতে ও দাক্ষিণাত্যে পাঠান হয় নাই। যে রাত্রে সুজা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আগরায় চলিয়া যান, সেই রাত্রে আমি পলায়নের চেষ্টা করিতে গিয়া এক ক্ষুদ্র গলি পথে কতকগুলি কাগজ পত্র কুড়াইয়া পাই। তাহার মধ্যে সুজার নামাঙ্কিত একটী অঙ্গুরীয়ক ছিল, সেই অঙ্গুরীয়কের সহায়তায় সুজার গমনের ক্ষণকাল পরেই আমি মুক্তিলাভ করিয়া আপনারও মুক্তিসাধন করি। আপনি তখন বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমি প্রকৃত রহস্য আপনাকে জানিতে দিই নাই। দিবার প্রয়োজনও ছিল না। মুক্তি লইয়াই আমাদের কথা। কাগজগুলি পরে আমি সময়ক্রমে আমাদের বৃদ্ধ দেওয়ানকে দিয়া পড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে সম্রাটের বিরুদ্ধে যুবরাজের

বিদ্রোহসূচক পত্র খানিও ছিল, আমি সেই খানির সহায়তায় এবার কার্য্যোদ্ধার করিব।”

কিরণরায় স্থির হইয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন, কথা শেষ হইবামাত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—“মা! যা বলিলি সমস্তই বুঝিলাম। কিন্তু সাহসুজা যদি ইহাতে ভয় না পান, যদি তোমার উপর কোন অত্যাচার করেন, তোমার পবিত্র কুমারী-ধর্ম্মের উপর কোনরূপ কলঙ্ক পড়ে, তখন কি হইবে মা? তুই কি মনে করিয়াছিস্—বৃদ্ধ কিরণরায় বংশের কলঙ্ক লইয়া, কন্যার কলঙ্ক লইয়া জীবিত থাকিবে?”

“পিতঃ! সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন, তাহার উপায় আমার হাতে। হিন্দুর ঘরে জন্মিয়াছি—প্রাণ অপেক্ষা সতীত্বের মূল্য বুঝি। পিতঃ! প্রাণ দিয়া সতীত্ব রক্ষা করিব।”

কিরণরায় আর প্রভার প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন—প্রভা যাহা ধরে, তাহা ছাড়ে না। তাহা ছাড়া তীক্ষ্ণ-

বুদ্ধিমতী প্রভা একবার তাঁহাকে যেরূপে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে এবারও নূতন কৌশলে কার্য্যোদ্ধার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব নহে। কিরণরায় অনেক গভীর বিষয়ে কন্যার মতামত লইয়া কাজ করিতেন—তাহার কথা শুনিয়া কাজ করিতেন। এ ক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসই রহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সেই দিন রাত্রে প্রভাবতী একবারও চক্ষু মুদ্রিত করে নাই। নানাবিধ উৎকট চিন্তায় রজনী কাটিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রাতে উঠিয়া, স্নান করিয়া, চন্দন-কুঙ্কুমাগুরু-পরিলেপিতা ও পট্টবস্ত্র-পরিধানা হইয়া প্রভাবতী তাহাদের গৃহদেবতা মহাকালীর মন্দিরে পূজার্থে উপস্থিত হইল।

সেই সুন্দরী কিশোরী, দেবীর সম্মুখে বসিয়া অঞ্জলি ভরিয়া, দেবীর পদে পুষ্পাদি অর্পণ

করিল। পরে যুক্তহস্তে ঊর্দ্ধমুখে ভবানীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া বলিল,—"মা গো! চিরকাল স্বহস্তে সেবা করিয়াছি—বাল্যকাল হইতে তোর মন্দির মার্জ্জনা করিতে শিখিয়াছি—যখনই মনে কোন যাতনা হইয়াছে, তখন তোকেই জানাইয়াছি; কিন্তু দেখিস্ মা! এবার যেন মান রক্ষা হয়। আমি অকূলে আত্মসমর্পণ করিতে চলিলাম। মা! তুই গৌরীরূপে কুমারী-মূর্ত্তি—দেখিস্ মা! যেন আমার কুমারী-ধর্ম্মে আঘাত না লাগে।" বালিকা প্রণত হইয়া দেবীর উৎসৃষ্ট পুষ্প লইয়া মন্দির ত্যাগ করিল।

সেই দিন তিথিনক্ষত্র ভাল, কিরণরায় কক্ষে আসিয়া প্রভাবতীকে বলিলেন,—"প্রভা! যদি যাইতেই হইবে, তবে শুভলগ্নেই যাত্রা প্রশস্ত। আজ দিন ভাল, চল আজই যাত্রা করা যা'ক।"

সেই দিন মধ্যাহ্নে সকলে রাজমহলে যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজমহলের ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যস্থ অন্তঃপুর-সংলগ্ন প্রাঙ্গণটী আজ নূতন বেশে সুসজ্জিত হইয়াছে। সদর তোরণ হইতে এই উঠান পর্য্যন্ত দুই ধারে লাল মখমল-মণ্ডিত কানাত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কানাতের মধ্যনিবিষ্ট দণ্ডসমূহের উপর প্রত্যেক ধারে এক একটী নিশান—এবং প্রত্যেক নিশানের শিরোদেশ পুষ্পমাল্যে ভূষিত। কানাতের শেষে একটী ক্ষুদ্র দ্বার—এই দ্বারের পরই প্রাঙ্গণ। প্রবেশ-দ্বারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধবেশী স্ত্রীলোকগণ পুরুষোচিত সাজে সজ্জিত হইয়া, শাণিত মুক্ত অসি-হস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই স্বল্প বিস্তৃত প্রাঙ্গণের শোভা আরও মনোরম। মধ্যে মধ্যে প্রস্তরময় কৃত্রিম বেদিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বেদিকা গুলি নাগকেশর, চম্পক, গোলাপ প্রভৃতি পুষ্পগুচ্ছে আবৃত। মধ্যে মধ্যে লতা-পুষ্পময় কুঞ্জ। তাহাতে

হীরামন, পাপিয়া, ভীমরাজ, বুলবুল প্রভৃতি মনের আনন্দে স্বর্ণ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তান ছাড়িতেছে। একস্থানে দশজন অন্তঃপুরচারিণী একত্র হইয়া একটী বিচিত্র চন্দ্রাতপের নীচে বসিয়া একতানে সারঙ্গ, বীণ, সেতার, জলতরঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র লইয়া করতালীর সুমধুর তালে সুরের উচ্ছ্বাস তুলিতেছে।

খোস্‌রোজের মেলা রূপের হাট—সৌন্দর্য্যের বাজার! সুজার অন্তঃপুরচারিণীগণ এবং মুসলমান ওমরাহের পত্নী ও দুহিতাগণে প্রাঙ্গণ প্রায় অর্দ্ধেক পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তগণেরও পরিবারদের মধ্যে অনেকে আসিয়া দেখা দিয়াছেন। অসংখ্য সুন্দরীর সমাগমে প্রাঙ্গণ যেন রূপ-জ্যোতিতে আলোকিত। যে দিকে দেখা যায়, বোধ হয় যেন সৌন্দর্য্য স্বয়ং নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কে কাহাকে দেখে, তাহার স্থিরতা নাই। সকলেই নিজ নিজ পণ্য দ্রব্য ও আলাপ পরিচয়

লইয়া ব্যস্ত। যাহারা এ ক্ষেত্রের সমস্ত আদব কায়দা জানে না, তাহারা অপরের দেখিয়া আদব কায়দার অনুসরণ করিতেছে। এই বিশাল জনতার মধ্যে দুইটি সুন্দরী—প্রাঙ্গণ-পার্শ্বস্থ এক ক্ষুদ্র লতাকুঞ্জের অন্তরালে দাঁড়াইয়া—মৃদুস্বরে কথোপকথন করিতেছিল।

ইহাদের মধ্যে একজন বলিতেছে—"সই! তুমি মুসলমানী ও আমি হিন্দু হইলেও এখন আর তোমায় আমায় কোন ভেদ নাই। আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া—হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ঘরে জন্মিয়া—সাহজাদার উপভোগ্যা হইয়াছি। এখন আমাদের দুইজনের অদৃষ্ট সমসূত্রে বদ্ধ। তুমি আমার হিতকামনা না করিলে কে আর করিবে? দেখ! এই উৎসবে আমি আমোদ করিতে আসি নাই—প্রতিহিংসা লইতে আসিয়াছি! যুবরাজ আজ এই উৎসবে অমৃতের ভাগ লইবেন, আমি ইচ্ছা করিয়া গরলের অংশ গ্রহণ করিব। আমি যাহা বলি, তাহা তোমায় করিতেই হইবে।"

অপরা উত্তর করিল—"দেখ বিবি! তুমি যা করিতে বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত। কিন্তু তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বের কোন কথা আমার কাছে গোপন করিলে চলিবে না। এক বিষয়ে যখন বিশ্বাস করিতেছ—তখন সকল বিষয়েই বিশ্বাস থাকা চাই। বল দেখি, আজ কি করিলে তোমার উপকার করা হইবে?"

প্রথমা উত্তর করিল—"ভগিনি! তবে শোন। হৃদয়ের জ্বালাময় কথা—যাহা উষ্ণ ধাতুস্রাবের ন্যায় হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, তাহার উচ্ছ্বাস দেখ! তুমি বোধ হয় জান, আমি পিতৃহীনা হইয়া নিরাশ্রয়া হওয়াতেই আমার এই দুর্দ্দশা। কিন্তু আমার পিতাকে বধ করিল কে—তাহার নাম শুনিবে? সে পাপিষ্ঠ জমীদার কিরণরায়!! আমাদের না ছিল কি? সুখ, ঐশ্বর্য্য, সবই ছিল—কিরণরায় তাহাতে আগুন ধরাইয়া গিয়াছে।

"কিরণরায় কি আগে এত বড় জমিদার ছিল?"

"না—তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। দুরাত্মা ভয়ানক ষড়যন্ত্রে তাহার মৃত জ্যেষ্ঠের সমস্ত সম্পত্তি অধিকার করে। আমার পিতা তাহার জ্যেষ্ঠ কুমুদরায়ের বাল্যসখা। বন্ধুত্বের অনু-রোধে তিনি কিরণের দুষ্ট সংকল্পের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়া, আমার পিতার উপর পাপিষ্ঠের ক্রোধ জন্মে। সে আমাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া পিতাকে পথের ভিখারি করিল। আমার এক বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সতীত্ব নাশ করাইল। আমি পিতামাতা হারাইয়া দারুণ মনস্তাপে পথের ভিখারিণী হইলাম—যৌবন-পণে আত্মবিক্রয় করিলাম। মনে করিয়াছিলাম, পিতার মৃত্যুশয্যায় যে প্রতিশোধের শপথ করিয়াছি, তাহা যুবরাজের সহায়তায় একদিন কোন না কোন উপায়ে রক্ষা হইবে। আজ সেই প্রত্যা-শিত দিন উপস্থিত।

"ভগিনি! আত্মকৌশলে তাহার কন্যার একখানি প্রতিকৃতি অপহরণ করিয়া যুবরাজকে

দেখাইয়াছি। আমার আশা সিদ্ধ হইয়াছে. যুবরাজের মনে তাহাতে ঘোর বিপ্লব ঘটিয়াছে। যুবরাজ আর একবার বহুদিন পূর্ব্বে ঘটনাবশে এই কিরণরায়ের সুন্দরী কন্যা প্রভাবতীকে আটক করিয়াছিলেন; কিন্তু সেবার কার্য্যসিদ্ধি হয় নাই। এবার এক বাণে দুই পাখী মরিবে—আমারও উদ্দেশ্য সিদ্ধি এবং যুবরাজেরও রূপতৃষ্ণা নিবারণ হইবে। কেমন বুঝিলে ত? আমি কিরণ-রায়ের কন্যার উপর প্রতিশোধ লইব। যুবরাজকে ইতিপূর্ব্বে আমি তাহার সখী বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়াছি। আর কিরণরায়ের কন্যাকে হস্তগত করা যে তাঁহার পক্ষে অতি সহজ, তাহাও বুঝাইতে পারিয়াছি।"

যে শুনিতেছিল, সে বলিল,—"কি করিতে হইবে শীঘ্র বল। অই দেখ উঠান লোকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জনাব এখনই বাহির হইবেন। তুমি যাহা বলিবে, তাহাতেই আমি প্রস্তুত।"

অপরা বলিল—"দেখ, নানা কারণে আমি কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতীর সম্মুখে যাইব না। তুমি উৎসবের গোলমালের মধ্যে সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাকে যে কোন কৌশলে পার—অথচ তাহার মনে সন্দেহ না হয়, এরূপ ভাবে উত্তর দিকের গলিপথের বিশ্রাম-গৃহে লইয়া যাইবে। ইহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।—"

পাঠক! উপদেশ-দাত্রীকে চিনিয়াছেন কি? ইনি আপনাদের পূর্ব্ব-পরিচিতা রঘুদেবের কন্যা—রত্নময়ী—সাহসুজার আদরের প্রণয়িনী রোসেনা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

সূর্য্যতেজ ক্রমশঃ অনলকণা-বিহীন হইয়া আসিল। তখনও দুই ঘণ্টা বেলা আছে, এমন সময়ে নহবত-ধ্বনি হইল। একটা রব উঠিল—বাদসাহ-পুত্র সাহসুজা আসিতেছেন।—প্রাঙ্গণের তত কোলাহল মুহূর্ত্তের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

যুবরাজ অন্তঃপুর হইতে বাহির প্রাঙ্গণে আসিলেন, সঙ্গে তাঁহার প্রধানা বেগম লুৎ-ফুন্নিসা। পশ্চাতে দুইজন বাঁদি। যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী প্রফুল্ল মুখে প্রত্যেক বেদিকার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে বাদসাহী প্রথা মত ক্রয় কার্য্য আরম্ভ করিলেন। ক্রয় শেষ হইলে তাঁহারা বিক্রয়িত্রীর পরিচয় গ্রহণ করিয়া সসম্ভ্রম অভিবাদনে সেস্থান ত্যাগ করিয়া অপর স্থলে গমন করিতে লাগিলেন।

যাহাদের ক্রয়-বিক্রয় হইয়া গেল, তাহাদের সকলেই একে একে চলিয়া গেল। ক্রমে যুবরাজ—কিরণরায়ের কন্যা প্রভাবতী যেখানে ছিলেন—তথায় গিয়া দাঁড়াইলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

তাঁহাকে দেখিয়া প্রভা, লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিতা হইল। তাঁহার সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রভা দেখিল, যুবরাজ এক

দৃষ্টে তাঁহার দিকে বিলোল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতেছেন। সে দৃষ্টিতে তাহার স্বাভাবিক আরক্তিম গণ্ডস্থল আরও লোহিত-রাগ-রঞ্জিত হইল। যুবরাজের সঙ্গে এখন আর কেহ নাই—তিনি একাকী। কেবল একটী স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিতেছিল।

সাহ-সুজা প্রভাকে চিনিতে পারিয়াও সে ভাব গোপন করিলেন। ধীরে ধীরে সহাস্যে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"সুন্দরি! তোমার পরিচয় জানিতে সৌভাগ্যবান হইব কি?"

প্রভাবতী সসম্ভ্রমে লজ্জা-বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন,—"আমার নাম—প্রভাবতী। আমি বীরভূমির জমীদার কিরণ-রায়ের কন্যা।"

সুজার শরীরের প্রত্যেক ধমনীতে, শিরায় শিরায়, বিদ্যুৎ ছুটিল। তাঁহার মুখমণ্ডলে পাশবিক প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল, তাঁহার হৃদয়ের সৎ বৃত্তিগুলি সৌন্দর্য্যের নিকট শিথিল হইয়া

পড়িল। তিনি একটু হাস্য করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। এ হাসির অর্থ—সরলা হরিণী ফাঁদে পড়িয়াছে। আশা অর্দ্ধেক সফলিত। এত সহজে যে কার্য্যসিদ্ধি হইবে, যুবরাজ তাহা আদৌ ভাবেন নাই।

সাহ-সুজা চলিয়া গেলে প্রভাবতী নিজের দাসীকে শিবিকার অনুসন্ধানে পাঠাইল, কিন্তু দাসীর ফিরিতে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিজে তাহার অনুসন্ধানে গেল। ইহাতেই তাহার সর্ব্বনাশের পথ অনুসূচিত হইল।

প্রাঙ্গণের পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র সরোবর, তাহার কূলে পাঁচ সাত খানি রৌপ্যমণ্ডিত কিংখাপাচ্ছাদিত শিবিকা দেখা যাইতেছিল। দাসী হয়ত সেই দিকে গিয়াছে ভাবিয়া, প্রভা ধীরে ধীরে পুষ্করিণী-তটে চলিল। পথে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"আমি বেগম সাহেবের

দাসী। বিবি! আপনি কি বেগম সাহেবের সহিত দেখা করিবেন? তাঁহার আদেশ আছে—আজ সকল রমণীই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।” প্রভা উত্তর করিলেন,—“না—আমি বাটী যাইব, আমার দাসীকে শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছিলাম, তাহাকে খুঁজিতেছি।”

“ওখানে যে সব পাল্কী দেখিতেছেন, উহা মুসলমান ওমরাহ-পত্নীদের। তাঁহারা প্রধানা বেগমের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন। আপনি যদি বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনার পাল্কী আনাইয়া দিতেছি।”

প্রভা নিজ দাসীর উপর একটু রাগ করিয়া সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গে চলিল। স্ত্রীলোকটী তাহাকে একটী গলি পথে লইয়া গিয়া বলিল,—“আপনি আমার গৃহমধ্যে বিশ্রাম করুন, আমি পাল্কী আনিতে চলিলাম। যদি দাসী বলিয়া ঘৃণা না করেন, তবে এই গৃহমধ্যে আসিয়া বসুন।”

মুগ্ধস্বভাবা প্রভা—তাহার যত্নে ভুলিয়া কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য—গৃহে প্রবেশ করিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তড়িৎবেগে সে গৃহের দ্বার আবদ্ধ হইয়া গেল। হতভাগিনী প্রভাবতী ব্যাধের ফাঁদে মুগ্ধা হরিণীর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। অনেক টানাটানি করিল, কিছুতেই দ্বার খুলিল না। প্রভা অগত্যা সেই কক্ষমধ্যে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

সে কক্ষ সেই বাঁদির কক্ষ নহে। বাতায়ন-পথে তখনও অস্তগামী সূর্য্যের মলিন কিরণমালা প্রবেশ করিতেছিল। সেই স্বল্পালোকে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে প্রভা দেখিল—কক্ষটী আদ্যোপান্ত মনোরম সজ্জায় সজ্জিত।

প্রভা মনে মনে বুঝিল—সে কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধা হইয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সুজা উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কক্ষে সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে রত্নময়ী আসিয়া সংবাদ দিল,—"জাঁহাপনা! পক্ষিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। আপনার শয়ন-গৃহের পার্শ্বে তাহাকে কৌশলে আবদ্ধ করা হইয়াছে।"

সুজা সংবাদ শুনিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট গৃহের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

আর হতভাগিনী প্রভা? সে অশ্রুজলে সেই মখমল-মণ্ডিত গৃহ ভাসাইয়া দিতেছে! সে ভাবিতেছে—"হায়! কেনই বা দুঃসাহসে ভর করিয়া পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে আসিলাম? না জানি অদৃষ্টে কি আছে? নিশ্চয়ই এ সাহ-সুজার চক্র। জীবন থাকিতে সে আমার উপর কখনই অত্যাচার করিতে পারিবে না। আমার যে দুইটী অমোঘ অস্ত্র আছে, তাহার একটীও

কি কাজে আসিবে না ? ভবানি ! ভবানি ! হৃদয়ে বল দাও মা—যেন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি।”

সহসা কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। গৃহের অপর পার্শ্বে আর একটী ক্ষুদ্র দ্বার—সাহ-সুজা সেই দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সুজা সেরাজি পান করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু লাল—সেই চিরসুন্দর মুখে ঘোর পাশব প্রকৃতির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে—হৃদয়ে ঘোর সম্ভোগ-বাসনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি টলিতে টলিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলি-লেন—“সুন্দরি ! বঙ্গেশ্বর সাহ-সুজা নিজে তোমাকে সম্মান দেখাইতে আসিয়াছেন, তোমার পদতলে বিক্রীত হইতে আসিয়াছেন। ভারতসম্রাটের পুত্র, হিন্দুস্থানের ভাবী অধিকারী সাহ-সুজা তোমার নিকট প্রণয় ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। সুন্দরি ! দাসের প্রতি প্রসন্না হও।”

দৃপ্ত সিংহীর ন্যায় প্রভা একবার বঙ্গাধি-পের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া এবং পরক্ষণেই মুখ অবনত করিয়া স্থির ভাবে উত্তর করিল—"জাঁহাপন অধিনী ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। আপনি রক্ষাকর্ত্তা হইয়া নিজে এ প্রকার অত্যাচার করিলে আশ্রিতদের উপায় কি? এ মাতৃহীনা হতভাগিনী বালিকার উঃ অত্যাচার করিলে, তাহাকে কলুষিত ভাবে সম্বোধন করিলে আপ-নার মহত্ত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে। আমায় ছাড়িয়া দিন—আপনার উদারতা কীর্ত্তন করিতে করিতে এ স্থান হইতে চলিয়া যাই।"

সুজা দাঁড়াইয়াছিলেন, প্রভার কাছে আসিয়া বসিলেন। প্রভা মুহূর্ত্ত মধ্যে সে স্থান ত্যাগ করিয়া দূরে দাঁড়াইল। সুজা সস্নেহ স্বরে বলিলেন,—"সুন্দরি! বিরাগ প্রকাশ করিও না। কিরণরায়ের কন্যাকে আমি বড়ই ভালবাসি। তোমার পিতাকে সেবারে বাকী খাজনার ও দাঙ্গার জন্য যখন আবদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন

কেবল তোমার মুখ চাহিয়া আমি তাহাকে পীড়ন করি নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। তুমি আমার হৃদয়ের পূজনীয়া দেবীর ন্যায় আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। এই হিন্দুস্থান এক দিন হয়ত তোমার পদতলে নত হইবে। সাহ-স্রুজা কখনও উপযাচক হইয়া কাহারও কাছে প্রেমভিক্ষা করেন নাই, তুমিই কেবল সেই বিষয়ে সৌভাগ্যবতী হইয়াছ।”

“না—না—যুবরাজ! আমি সৌভাগ্য চাহি না। সমগ্র হিন্দুস্থান অপেক্ষা পর্ণকুটীর আমার পবিত্র সাম্রাজ্য। যুবরাজ একবার আপনার প্রপিতামহ সেই গৌরবান্বিত আকবর সাহের মহত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। সেই গৌরবা-ন্বিত আকবর সাহের পবিত্র গৌরবের অনুরোধে আমায় ছাড়িয়া দিয়া হৃদয়ের উদারতা দেখান।”

“না—না—না—শুধু কথায় হইবে না, তুমি বড়ই অবোধ বালিকা!! সুন্দরি! যাহা বলি শোন—সহজে না শুনিলে বল প্রকাশ করিব।”

"হাঁ—নিরীহা—নিঃসহায়া কুমারীর প্রতি বলপ্রয়োগে . আপনার পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব বাড়িবে বই কমিবে না !"

সুজা এ উত্তরে ভুলিলেন না। ক্ষিপ্রগতিতে প্রভাবতীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। প্রভার শরীরে প্রবল বেগে ঘর্ম্ম নিঃসরণ হইতে লাগিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল, তথাপি সে সাহস সঞ্চয় করিয়া সবলে নিজ হস্ত ছাড়াইয়া লইল। সুজা আবার ধরিতে গেলেন—বালিকা সরিয়া দাঁড়াইল।

ব্যাঘ্র যেমন শীকারের উপর লম্ফ দিবার পূর্ব্বে স্থির হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে, এখন সুজার অবস্থাও তদ্রূপ। পাছে প্রভা উন্মুক্ত দ্বারপথে বাহির হইয়া যায়, এই ভয়ে সেই সৌন্দর্য্য-লোলুপ সাহসুজা দ্বারটী আগে বন্ধ করিয়া দিলেন। প্রভাবতী আরও নিঃসহায় হইয়া পড়িলেন।

সুজা পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"সুন্দরি!

খোস্‌রোজের এই উৎসবের আয়োজন কেবল তোমার ন্যায় সুন্দরী পক্ষিণীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিবার জন্য—আমি তোমার রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছি—জীবনে কখনও কাহারও এরূপ উপাসনা করি নাই—তাহাও করিতেছি। এই লও—আমার রত্নখচিত মুকুট তোমার সুকোমল রক্তরাগ-পরিলাঞ্ছিত চরণতলে অর্পণ করিলাম! হিন্দুস্থানের ভাবী বাদসাহ তোমার পায়ে ধরিতেছেন, তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্না হও।" এই বলিয়া সাহসুজা সেই সুন্দরী কিশোরীর গাত্র স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন।

ক্রুদ্ধা কেশরিণীর ন্যায় মরাল-গ্রীবা উন্নত করিয়া প্রভা বলিল—"সাবধান! গাত্র স্পর্শ করিয়া এ দেহ কলঙ্কিত করিও না। আমায় ছাড়িয়া দাও—আমি চিরকাল তোমা অপেক্ষা তোমার মহত্ত্বকে শত গুণে পূজা করিব।"

প্রভার কথাগুলি সেই নির্জ্জন কক্ষে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। সুজা আর অপেক্ষা

করিতে পারিতেছেন না—তিনি দ্বারের দিকে এক বার দৃষ্টিপাত করিয়া পুনরায় প্রভাকে আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিতে ধাবিত হইলেন।

"যুবরাজ! এখনও বলিতেছি—সাবধান! নচেৎ তোমার সম্বন্ধে কোন অশুভকর কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব। সে কথা প্রকাশ হইলে নিশ্চয় জানিও, তুমি পথের ভিখারীরও অধম হইয়া পড়িবে। হয়ত বৃদ্ধ সম্রাটের জল্লাদের হস্তে তোমার ঐ মুকুট-শোভিত মস্তক ধরাশায়ী হইবে। এ অত্যাচারের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।

সুজা বলিলেন—"সুন্দরি! এমন কি কথা—যাহাতে আমি তোমার সম্পূর্ণ অধীন হইয়া পড়িব! ভারত-সম্রাটের পুত্র জীবনে এমন কোন কার্য্য করেন নাই, যাহাতে এক অপরিচিতা বাঙ্গালী যুবতী তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন করিতে সাহসী হয়!" সুজা আবার প্রভার দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভা দ্বারের দিকে সরিয়া গিয়া বিদ্রূপ-সূচক হাস্য করিয়া বলিল—"যুবরাজ! সাবধান! মওয়াজী খাঁর সহিত চক্রান্তের ব্যাপার প্রকাশ হইলে বোধ হয় আপনার কোন ইষ্টানিষ্ট নাই?"

সহসা আশীবিষ-দষ্ট হইলে মানব যেরূপ কাতর হইয়া পড়ে, সুজাও সেইরূপ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মুখ শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তাঁহার দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল। মওয়াজী খাঁর নাম সুজার কাণে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ ভুজঙ্গবৎ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন।

প্রভা দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে। ধীরে ধীরে বলিল—"ঘটনা-ক্ষেত্রের মধ্যে পড়িয়া দাসী যদি ভারতেশ্বরের পুত্রের প্রতি কোনরূপ অসম্মান ব্যবহার করিয়া থাকে, তজ্জন্য সে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। যুবরাজ! আপনার সম্মুখের দ্বার খুলিয়া দিন, আমায় বাহিরের পথ

দেখাইয়া দিন—আমি পিতার কোলে গিয়া আপনার এসব অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যাই। আমি দেবতার নামে শপথ করিতেছি, আমার দ্বারা একথা ঘুণাক্ষরে প্রকাশ হইবে না।”

“যুবরাজ! আরও শুনুন—মওয়াজি খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া বাদসাহকে বিষ প্রয়োগ জন্য আপনি দিল্লীতে যে গোপনীয় পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাও আমার কাছে; এই দেখুন তাহার প্রতিলিপি।”

সুজা! পত্রখানি গ্রহণ করিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অত্যন্ত অত্যাচারী হইয়াও তিনি তখন শিশুর ন্যায় শান্তভাব অবলম্বন করিলেন। দেয়াল ধরিয়া এক আসনের উপর ধীরে ধীরে উপবিষ্ট হইলেন।

সাহসুজা অনেক ক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার এক নূতন মৎলব আঁটিলেন। তাঁহার মনে যে ভয় হইয়াছিল, ক্রমে তাহা

অপসারিত হইল। তিনি প্রকাশ্যে ঘৃণাসূচক হাস্য করিয়া বলিলেন,—"সুন্দরি! যদিও বা তোমার উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত ছিল, কিন্তু এখন তাহা চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইয়া গেল। তোমার ধৃষ্টতার ফলে আজই বৃদ্ধ কিরণরায় অবরুদ্ধ হইয়া অন্ধতমসাবৃত কারাগার আশ্রয় করিবে। আর তাহাকে আলোক দেখিতে হইবে না।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি পুনরায় প্রভাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য সবেগে তাহার নিকটস্থ হইলেন।

"তবে দেখ্ কাপুরুষ! হিন্দুরমণী কিরূপে আপনার সতীত্ব রক্ষা করে, কিরূপে তাহার কুমারী-ধর্ম্ম পালন করে।" এই কথা বলিয়া প্রভা নিজ বক্ষ-মধ্যস্থ বস্ত্র হইতে এক তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বাহির করিল। দীপালোকে সেই ছুরিকা চক্‌মক্ করিয়া উঠিল এবং সুজা দ্বারের নিকট ফিরিতে না ফিরিতে তাহা সবেগে তাঁহার স্কন্ধদেশে বিদ্ধ হইল। সুলতান ভূতলে

পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। রক্তস্রাবে গৃহ ভাসিয়া গেল—তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

* * * *

এই শোচনীয় ঘটনার পর তিন দিন অতীত হইয়াছে, সুজা অন্তঃপুরস্থ এক কক্ষ মধ্যে রুগ্ন-শয্যায় শায়িত। প্রধানা বেগম লুৎফুন্নিসা তাঁহার শয্যার উপর বসিয়া ব্যজন করিতেছেন ও তাঁহার ক্ষত স্থানে প্রলেপ লাগাইয়া দিতেছেন।

সাহসুজা ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিলেন। ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কোথায় ?"

আজ তাঁহার প্রথম চেতনা হইয়াছে। পতিপ্রাণা লুৎফুন্নিসা তৎক্ষণাৎ কাতর ভাবে বলিলেন,—"যুবরাজ—জাঁহাপনা ! কথা কহিবেন না। চিকিৎসকের নিষেধ, ক্ষণকাল স্থির ভাবে থাকুন। সবই শুনিবেন।"

"না—না—আমি এখনই শুনিতে চাই।

আমার সকল কথা মনে পড়িতেছে। কোথা সেই দুরাত্মা কিরণরায়ের পাপীয়সী কন্যা? তাহার পিতার শোণিতে কি এখনও ধরাতল শীতল হয় নাই! কে আছিস্! শীঘ্র আয়—শীঘ্র কিরণ-রায়ের ও তাহার কন্যার মস্তক এই স্থানে আনিয়া দে—"

সুজা আর বলিতে পারিলেন না—উত্তেজনা বশে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পার্শ্বোপবিষ্টা তাঁহাকে কোন উত্তেজক ঔষধ দিলেন, তাহাতে আবার চেতনা আসিল। সুজা আবার নয়ন উন্মীলন করিলেন, ধীরে ধীরে আবেগভরে বলিলেন—"প্রিয়তমে! প্রভাবতি! তুমি কোথায়? একবার হৃদয়ে এস—এ দগ্ধ হৃদয়ের যাতনা লাঘব করিয়া দাও। না—না—তুই পিশাচী! সয়তানী!!

পার্শ্বোপবিষ্টা সুন্দরী ধীরে ধীরে উত্তর করিলেন—"হাঁ যুবরাজ! সে সত্য সত্যই পিশাচী! সে সত্য সত্যই সয়তানী! রোসেনা

বেগম তাহার পলায়নের সময় পথরোধ করিতে গিয়াছিল, সে তাহাকেও সাংঘাতিক আঘাত করিয়া পলাইয়াছে। যুবরাজ! সে পাষাণীর—সে হতভাগিনীর নাম আর মুখে আনিবেন না।"

সুজা ধীরে ধীরে নয়ন মুদ্রিত করিলেন। একটা দীর্ঘনিশ্বাস সেই দুগ্ধফেননিভ শয্যার উপর বহিয়া গেল। তিনি কাতর ভাবে অস্ফুট-স্বরে বলিলেন—"হায় হায়! সুখের উৎসব রুধি-রোৎসবে পরিণত হইল!"

ইহার পর সুজা বহুকষ্টে আরোগ্য লাভ করিলেন। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন, এই "রুধিরোৎসবের" স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই।

লাল বারদোয়ারি।

লাল বারদোয়ারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গবান একলিঙ্গের মন্দিরে আজ বিরাট মহোৎসব। "কুমারীব্রত" উদযাপনাভিলাষিণী যত রাজপুত-বালিকা প্রাতঃকাল হইতে মন্দির মধ্যে দলে দলে উপস্থিত হইয়াছে।

দীন, দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত, রাজা প্রজা সকলেরই কন্যাগণের নিকট আজ দেব-মন্দিরের দ্বার সমান ভাবে উন্মুক্ত। সমাজের ও ঐশ্বর্য্যের

পার্থক্য যেন সকলে আজ মন্দিরের বাহিরে রাখিয়া আসিয়াছে।

ফল, ফুল, বিল্বপত্র, অর্ঘ্য, অগুরু চন্দনাদিতে একলিঙ্গের মূর্ত্তি সমাচ্ছন্ন। লিঙ্গমূর্ত্তির চারিদিকে সুবর্ণবেষ্টনী—আর তাহার চারিপাশে অনাঘ্রাত মল্লিকাকুসুমসদৃশী বালিকাগুলি মুখে পবিত্র সরলতা, তেজস্বিতা ও মধুরিমা মাখিয়া একাগ্রচিত্তে একলিঙ্গের উপাসনা করিতেছে।

ব্রতের উদ্দেশ্য—মনোমত পতিলাভ। যাহার ব্রত সমাপ্ত হইতেছে, সে পুরোহিতের দক্ষিণা দিয়া মন্দির হইতে চলিয়া যাইতেছে। যাহার শিবিকা আছে, সে গিয়া সওয়ার হইতেছে। যাহার নাই, সে পদব্রজে চলিয়াছে। যাহারা অনেক দূর হইতে আসিয়াছে, তাহারা মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ চত্বরে আসিয়া জমিতেছে। আর যাহার কোন কাজই নাই, সে অপরের সহিত গল্প করিতেছে।

ক্রমশঃ বেলা বাড়িতে লাগিল—সকলেই

প্রায় পূজা সাঙ্গ করিয়া মন্দির ত্যাগ করিল। কিন্তু একটী রাজপুত-বালিকা তখনও পূজায় সন্নিবিষ্টমনা।

বালিকা—শিশোদিয়া-বংশীয়া। সে তেজোময়ী; তাহার মুখে প্রতিভা, দীপ্তি ও সরলতা, একাধারে বিরাজ করিতেছে। তাহার সম্মুখে পুষ্পপাত্র—হস্তদ্বয় অঞ্জলিবদ্ধ—চক্ষু স্থির ও মুদিত। সুগ্রথিত মনোহর নাগকেশর-মালা সেই আলুলায়িত ভ্রমর-কৃষ্ণ কেশরাজির উপর বেষ্টন করিয়াছে। পূজা সমাপ্ত হইলে বালিকা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া করপুটমধ্যস্থ অবশিষ্ট পুষ্পগুলি দেবতার চরণে অর্পণ করিল।

মন্দির-রক্ষক এক শৈব সন্ন্যাসী স্থির-দৃষ্টিতে বালিকার পূজা দেখিতেছিলেন। পূজা সাঙ্গ হইল দেখিয়া, তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা! ভোগের সময় হইয়াছে, মন্দিরতল মার্জ্জনা করিয়া দাও" বালিকা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া মন্দির

হইতে বাহির হইয়া গেল। সেকালের প্রথা ছিল—ভোগের পূর্ব্বে কুমারীগণ মন্দিরতল মার্জ্জনা করিতেন।

সেই কিশোরী ত্বরিতপদে মন্দিরের সোপান-শ্রেণী অবতরণ করিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল—শিবিকা খানি রহিয়াছে, কিন্তু বাহকেরা তথায় নাই। বাহকেরা বিলম্ব দেখিয়া নিকটস্থ বাজারে জলযোগ করিতে গিয়াছিল। তাহাদের বিলম্ব দেখিয়া শিশোদিয়া-বালিকা ধীরে ধীরে মন্দির-সংলগ্ন পলাশ-কাননে প্রবিষ্ট হইল।

"পলাশ-কানন" একলিঙ্গের মন্দিরসংলগ্ন উদ্যান। উদ্যানে পলাশ বৃক্ষের ভাগ বেশী বলিয়া ইহার নাম "পলাশ-কানন" হইয়াছিল। কাননের মধ্যস্থলে কাকচক্ষু-বিনিন্দিত সুবিমল সলিলরাজি-পূর্ণ সুবিস্তৃত সরোবর। সরোবরের চারিদিকে দশটী দেবমন্দির। দেবমন্দির ব্যবধানে নানাবিধ ফল-পুষ্পপরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি। বালিকা একে একে সেই সরোবর-পার্শ্বস্থ দেবমন্দিরগুলি দেখিতে লাগিল।

প্রথমটী—গণেশমূর্ত্তি, দ্বিতীয়টী-মকরবাহিনী শ্বেতমর্ম্মরময়ী গঙ্গামূর্ত্তি, তৃতীয়টী মহেশ্বরের সংহারমূর্ত্তি। বালিকা এইগুলিকে দেখিয়া যেমন চতুর্থটীর সম্মুখে আসিবে, অমনি বৃক্ষান্তরাল হইতে এক শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত যুবকমূর্ত্তি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পথে চলিতে চলিতে সম্মুখে কৃষ্ণকায় বিষধর দেখিতে পাইলে পথিক যেরূপ চমকিত হইয়া উঠে, সহসা সেই নির্জ্জন কানন মধ্যে সেই শুভ্রবসনধারী যুবা পুরুষকে দেখিয়া সেই প্রফুল্লমুখী বালিকাও সেইরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বালিকা দৃঢ়স্বরে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"দুর্জ্জয়সিংহ! এখানে আসিলে কেন?"

"অনুসূয়ে! আসিলাম কেন, জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি যেমন ভাবিতেছ, আমি কেন এখানে—আমিও সেইরূপ ভাবিতেছি তোমার কোমল হৃদয়ে কঠিনতা কোথা হইতে আসিল!"

"দুর্জ্জয় সিংহ! কুলকন্যার সহিত এ প্রকার স্থলে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ, নিতান্ত নির্দ্দোষ ব্যাপার নয়, তুমি এখান হইতে চলিয়া যাও।"

"অনুসূয়ে! তুমি বড় নিষ্ঠুর! তাহা না হইলে আমায় চলিয়া যাইতে বলিতে না। আর কতদিন হৃদয়ে দারুণ জ্বালা পোষণ করিয়া অনন্ত যন্ত্রণা ভোগ করিব? কতদিন ধরিয়া তোমায় দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু কোন সুযোগই পাই নাই। তোমার সুন্দর মুখ-খানি একবার দেখিলে আমার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠে, আমি পৃথিবী ছাড়িয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করি, একবার তোমার মুখে দুটী মিষ্ট কথা শুনিলে আমি সকল যন্ত্রণা ভুলিয়া যাই। তোমার বাটীর দ্বার আমার নিকট রুদ্ধ। আজ ভগবান একলিঙ্গের কৃপায় যদি সাক্ষাৎ পাইয়াছি, তবে কেন চিরসঞ্চিত আশা কথঞ্চিৎ পরিপূর্ণ করিব না?"

অনুসূয়া এবার কঠোর স্বরে বলিল,—"দুর্জ্জয়সিংহ! আমি কুলকন্যা, আমার সহিত নির্জ্জনে এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহা তোমার সম্পূর্ণ অনুচিত। তুমি পথ ছাড়িয়া দাও—আমি চলিয়া যাই।"

"চলিয়া যাইবে—যাও অনুসূয়ে! যাও, দগ্ধ হৃদয়কে আরও দগ্ধ করিয়া যাও। কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখিও—আমি তোমার জন্য কি না সহ্য করিয়াছি? দেখ, পিতা মাতা ত্যাগ করিয়াছি, দেশ ত্যাগ করিয়াছি, রাঠোরের স্বভাবসিদ্ধ স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া বাদসাহের অধীনতা স্বীকার করিয়াছি। অগাধ ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া তরবারি-বিনিময়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছি। অনুসূয়ে! এতেও কি তোমার দয়া হইবে না? আমি কি চিরকালই নিরাশ হৃদয়ের যন্ত্রণা লইয়া নির্জ্জনে দগ্ধ হইব!"

অনুসূয়া স্থির হইয়া কথাগুলি শুনিল, দৃঢ় অথচ কম্পিত স্বরে বলিল—"দুর্জ্জয়সিংহ!

সে সব বিবেচনার ইহা উপযুক্ত স্থল নহে। দেখ, লোকে যদি এই অবস্থায় আমাদের দেখে, কি মনে করিবে বল দেখি!”

দুর্জ্জয়সিংহ হাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“বলিবে আর কি? সকলে ভাবিবে, দুর্জ্জয়সিংহ তাহার ভাবী পত্নীর সহিত নির্জ্জনে কথোপকথন করিতেছে।”

এ তীব্র অপমান, দর্পিতা অনুসূয়ার সহ্য হইল না। তাহার শতদল-সুন্দর মুখখানি ক্রোধে আরও রক্তিমভাব ধারণ করিল। বালিকা দৃঢ় কণ্ঠে বলিল—“রাঠোর-কুলকলঙ্ক! দূর হও, তুমি যখন নিজের স্বার্থের মুখে ভগিনীকে মোগলের হস্তে বলিদান করিয়াছ, তখন পরস্ত্রীকে কাপুরুষের ন্যায় এরূপে অপমানিত করা তোমার পক্ষে অতি সামান্য কার্য্য। তুমি যদি সহজে এ স্থান হইতে চলিয়া না যাও, তবে চীৎকার করিয়া লোক ডাকিব।”

এই তীব্র ভৎসনায়, দুর্জ্জয়ের মুখ

মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় হইয়া উঠিল। বদনে ভীষণ ভ্রুকুটি দেখা দিল। কঠোর হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি কহিলেন—"অনুসূয়ে! রাঠোর কখন নীরবে এরূপ তীব্র অপমান সহ্য করে না। ইহার প্রতিশোধ—যদি স্ত্রীলোক না হইতে, আজই পাইতে। কিন্তু এ অপমানের প্রতিশোধ একদিন নিজহস্তে লইব। তোমায় যদি মুসলমান-হস্তগতা না করিতে পারি, যদি এ দুরন্ত অহঙ্কার চূর্ণ করিতে না পারি, তবে দুর্জ্জয়ের নাম এই পৃথিবীর সীমা হইতে অন্তর্হিত হইবে।" দুর্জ্জয়সিংহ ক্রোধভরে আর কিছু না বলিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

অনুসূয়া দুর্জ্জয়সিংহকে চিনিতেন। সুতরাং এই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা-বাক্য তাঁহার চিন্তাহীন মনে ভবিষ্যতের একটা অশুভছায়া আনিয়া দিল। তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ভাবিতে ভাবিতে উদ্যান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অনুসূয়া ওমরাহ অরিসিংহের একমাত্র কন্যা। শিশোদিয় বংশের এক শাখা, রাজস্থানের গৌরবস্বরূপ মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যুর পর, কোন কারণে মিবারের পার্ব্বত্য প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া, আগ্রার অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করিতে লাগিলেন। উল্লিখিত নূতন দুর্গাধিপতি যশোসিংহ, প্রতাপের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকিয়া "হলদীঘাটের" স্মরণীয় যুদ্ধে সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। স্বয়ং কুমার সেলিম, যশোসিংহের ক্ষিপ্রহস্তে তরবারি ধারণের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। পিতার নিকট ভবিষ্যতে হলদীঘাটের যুদ্ধবর্ণনা করিবার সময়—তিনি প্রতাপ-সহচর, যশোসিংহের বীরত্বের কথা উল্লেখ করিতে ছাড়েন নাই। উদারহৃদয় আকবর, বীরের সম্মান রাখিতে জানিতেন।

প্রতাপসিংহের উপর অত্যাচারের জন্য ইতিহাসকারেরা তাঁহাকে কলঙ্কমণ্ডিত করিয়াছেন, কিন্তু যশোসিংহের প্রতি উদারতা দেখাইতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই।

যশোসিংহের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া, তিনি তাঁহাকে মহারাজ মানসিংহের অধীনস্থ সৈন্যপুঞ্জের একাংশের পরিচালন-ভার দিতে চাহিয়াছিলেন। গর্ব্বিত যশোসিংহ, বাদসাহের সে অনুগ্রহ সহজেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র অরিসিংহ পরিশেষে অনন্যোপায় হইয়া জাহাঙ্গীর বাদসাহের অধীনে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষ ভাগে, যে সমস্ত রাজপুত-সামন্ত মন্সবদারী লাভ করিয়াছিলেন, অরিসিংহ তাঁহাদের মধ্যে একজন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর সাহজাহান সম্রাট হইলেন। তিনি হিন্দু ওমরাহদের উপর বড় একটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। এই জন্য অরিসিংহকে প্রথম প্রথম

বড় অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু সাহজাহানের প্রিয় ওমরাহ মুক্তিয়ার খাঁর সহায়তায়, ক্রমে অরিসিংহের যশ ও প্রতিপত্তি অন্যান্য হিন্দু ওমরাহদিগের অপেক্ষা অধিক হইয়া উঠিল।

এরূপ সহায়তা উষ্ণ-রক্ত শিশোদিয়ের পক্ষে নিতান্ত প্রার্থনীয় না হইলেও, নানা কারণে অবস্থার বৈগুণ্যে, অরিসিংহ মুক্তিয়ারের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে, আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুতা নানা কারণে অতিশয় দৃঢ়-ভাব ধারণ করিয়াছিল—মুক্তিয়ারের জন্যই বাদসাহ-সরকারে তাঁহার যশ প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

একদিন মুক্তিয়ার সান্ধ্যবায়ু সেবন করিতে করিতে অরিসিংহের ক্ষুদ্রদুর্গের কাছাকাছি আসিয়া পড়িলেন। এত কাছে আসিয়া বন্ধুর সহিত দেখা না করিয়া যাওয়াটা ভাল দেখায় না বলিয়া তিনি পুরী প্রবেশ করিলেন।

পুরীর বহিঃপ্রকোষ্ঠে তাঁহার অবারিত দ্বার—তিন বরাবর উপরের বারদোয়ারি গৃহের সম্মুখস্থ হইলেন।

দেখিলেন—এক বিচিত্র অজিনাসনের উপর বসিয়া,অরিসিংহ নিমগ্নচিত্তে একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন—আর এক স্থির-বিদ্যুল্লতা-তুল্যা হৈম-মৃণালিনী-সদৃশী, জ্যোতির্ম্ময়ী যৌবনোন্মুখী কিশোরী তাঁহার কাছে বসিয়া স্থিরকর্ণে তাহা শুনিতেছে।

গ্রন্থখানি চাঁদকবির তেজ-তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস-ময় সমরগীতি। অরিসিংহ প্রত্যহ পুরাণাদির ন্যায় এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতেন। পড়িতে পড়িতে তাঁহার বীরহৃদয় স্ফীত হইয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিত—চৌহান বীরের কীর্ত্তি-কাহিনী তাঁহাকে মাঝে মাঝে উন্মত্তের মত করিয়া তুলিত। অরিসিংহ পড়িতেন—আর কাছে বসিয়া শুনিত—তাঁহার সুন্দরী কন্যা অনুসূয়া।

মুক্তিয়ার পূর্ব্বে অরিসিংহের কন্যার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়াছিলেন। আজ তাঁহার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিল। তিনি মুগ্ধচিত্তে সেই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য—সেই ভুবন-বিমোহিনী যৌবনোন্মুখী মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় হারাইলেন। তিনি দেখিলেন, চন্দ্র-কিরণের উজ্জ্বলতা—পুষ্পের কোমলতা—নবনীতের স্নিগ্ধতা, মথিত করিয়া ঈশ্বর যেন নির্জ্জনে সেই অপ্সরামূর্ত্তির মুখ গড়িয়াছেন।

মুক্তিয়ার উন্মুক্ত দ্বার-পথে কতবার সেই মোহনকান্তি দেখিলেন—তথাপি তাঁহার দর্শন-তৃষ্ণা মিটিল না। যত দেখেন—আরও দেখিতে ইচ্ছা হয়। দর্শনে আকাঙ্ক্ষা—অভিলাষে প্রেম! মুক্তিয়ারের পাষাণ বীরহৃদয় শেষে প্রণয়ের মধুর উচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিল!

চৌরের ন্যায় এপ্রকার ভাবে ভয়ে ভয়ে সন্তর্পণে দেখায় ফল নাই দেখিয়া, তিনি গৃহ প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন—"অরিসিংহ!"

অরিসিংহ দেখিলেন—মুক্তিয়ার আসিয়াছেন। তিনি পুস্তক বন্ধ করিয়া উঠিয়া, বন্ধুর সংবর্দ্ধনা করিলেন। আর সেই বিদ্যুদ্দাম-তুল্যা উজ্জ্বল-প্রভাময়ী অনুসূয়া—সে অলক্ষ্য-ভাবে একটী বীরহৃদয় দলিত করিয়া, মরাল-গতিতে সৌন্দর্য্যের বিজলীবৃষ্টি করতঃ সে গৃহ হইতে চলিয়া গেল।

মুক্তিয়ারের চমক হইল। তিনি কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"অরিসিংহ! এই কি তোমার কন্যা?"

"কেন, তুমি কি ইহাকে দেখ নাই?"

"না—আজ প্রথম দেখিলাম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মেয়ে এত বড় করিয়া রাখিয়াছ—বিবাহের চেষ্টা দেখিতেছ না যে?"

"ভাই! জান ত আমরা জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ঈশ্বরাধীন বলিয়া ভাবি—চৌহান রাজকুমারের সহিত এখন কথা চলিতেছে, কতদূর কি হয় বলা যায় না।"

মুক্তিয়ার স্থির চিত্তে কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন—"অরিসিংহ! একটী কথা বলিব কি?"

"বল, স্বচ্ছন্দে বল"।

"তুমি আমার অনুরোধ রাখিবে?"

"রাখিবার হয় রাখিব—আমি তোমার কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ।"

"ওকথা ছাড়িয়া দাও। যাহা বলিব, তাহা শুনিয়া স্তম্ভিত বা বিস্মিত হইবে না?"

অরিসিংহ ভূমিকা দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, বলিলেন—"বলিয়া যাও"।

মুক্তিয়ার গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"অরিসিংহ! আমি তোমার কন্যার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছি—আমি তাহাকে বিবাহ করিব!"

অরিসিংহ বসিয়াছিলেন, সহসা বিষধর-দষ্ট ব্যক্তির ন্যায় সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল। তিনি সদম্ভে দৃপ্তসিংহের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"মুক্তিয়ার! এখনি এ পুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও।

শিশোদিয়-বংশে আজ পর্য্যন্তও এমন কেহ কুলাঙ্গার জন্মে নাই, যে কন্যা-বিক্রয়ে কৃতজ্ঞতার পণ রক্ষা করে।”

মুক্তিয়ার অপমানিত হইয়া রোষভরে সবেগে সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজপথ নির্জ্জন। রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। পথি-পার্শ্বস্থ আলোক মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। অদূরে সরাই, সরাই পার হইলেই আগরা সহর।

মুক্তিয়ার বীরপুরুষ ও গর্ব্বিত। পাঠানের উষ্ণ রক্ত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। তিনি সাহজাহানের দক্ষিণ হস্ত। প্রত্যাখ্যাত হইয়া অপমানে ক্রোধে মুক্তিয়ার দন্তে

দন্তে ঘর্ষণ করিয়া আপন মনে বলিতেছিলেন—"অরিসিংহ! নির্ব্বোধ অরিসিংহ! ক্ষমতায় তুমি মুক্তিয়ার খাঁর তুলনায়, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতম। মুক্তিয়ার—তোমার মত শত শত রাজপুত ওমরাহকে নিজের স্বার্থের মুখে কীট-পতঙ্গের ন্যায় চরণ-দলিত করিতে পারে। তুমি দাম্ভিকতায় ভুলিয়া তাহার অপমান করিয়াছ, তোমার পতন অনিবার্য্য।"

মুক্তিয়ার অস্ফুটস্বরে এই প্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে সেই অন্ধকারের মধ্যে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ সহসা কোন অপরিচিত-হস্তের স্পর্শানুভব করিল। পাঠান চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, পরুষ-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কে তুমি?"

"আমি আপনার হিতকারী।"

"তুমি মুসলমান?"

"না—হিন্দু—রাজপুত।"

"রাজপুত! অসম্ভব! তোমার উদ্দেশ্য কি

শীঘ্র বল? নচেৎ তোমার মুণ্ড এখনি এই তীক্ষ্ণ-কৃপাণের শক্তি অনুভব করিবে।"

"আপনাকে বোধ হয় অত কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। আপনি ওমরাহ অরি-সিংহের বাটী হইতে আসিতেছেন?"

"হাঁ—তোমার তাহাতে কি প্রয়োজন?"

"আপনি অপমানিত হইয়াছেন—অরি-সিংহকে চিনেন না। তাহার কন্যার হস্ত প্রার্থনা করা আপনার উচিত হয় নাই।"

মুক্তিয়ার স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না—এই অন্ধকার-বেষ্টিত দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ কে? তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে বলিলেন—

"তুমি এসব সংবাদ জানিলে কিরূপে?"

"সে কথায় এখন প্রয়োজন নাই—আমি আপনার সংকল্পে সহায়তা করিতে আসিয়াছি। সব খুলিয়া না বলিলে আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?"

"তোমার নাম?"

"এখন বলিব না—আগে বলুন, আমার সহায়তা লইবেন কি না? আমি অরিসিংহের শত্রু।"

"ভাল, তাহাই হইবে—মুসাফের-খানায় চল।"

না—আজ আর আমি বেশীক্ষণ থাকিব না। দুর্গমধ্যে আপনার আবাসে গিয়া কল্য মধ্য-রাত্রে দেখা করিব।"

অত রাত্রে তোমায় দুর্গে প্রবেশ করিতে দিবে কেন?"

"আপনি নিদর্শন দিন। কোন আপত্তি হইবে না।"

মুক্তিয়ার অঙ্গুলি হইতে অঙ্গুরীয়ক মোচন করিয়া দিলেন।

"তবে আপনি আমার সহায়তা লইতে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার পণ কি শুনিবেন?"

"আমি তোমায় পঞ্চাশ দীনার পারিতোষিক দিব।"

"আমি মুদ্রা অতি তুচ্ছ বিবেচনা করি—ইচ্ছা করেন ত, উহার দ্বিগুণ মুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।"

"তুমি তবে কি চাও?"

মুক্তিয়ারের কাণে কাণে অপরিচিত ব্যক্তি দুই চারিটী কথা বলিলেন। মুক্তিয়ার ইহাতে চমকিয়া উঠিলেন। পরে কি ভাবিয়া বলিলেন—"তাহাই হইবে।"

অভিবাদন করিয়া আগন্তুককে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া, মুক্তিয়ার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

"দুর্জ্জয়সিংহ।"

নাম শুনিয়া পাঠান কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। যদি সেই সময়ে স্বর্গ হইতে হুরীগণ আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিত, তাহা হইলেও মুক্তিয়ার খাঁ অতদূর বিস্মিত হইতেন না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বলা বাহুল্য, উল্লিখিত ঘটনার পর বাদসাহের সরকারে অরিসিংহের দিন দিন প্রতিপত্তি কমিতে লাগিল। তিনি প্রথম প্রথম প্রায়ই আমখাসে হাজিরা দিতেন—কিন্তু নানাপ্রকারে অপমান ও অনাদর ঘটাতে, যাতায়াত একপ্রকার বন্ধ করিলেন। ইহার মধ্যে এক দিন আমখাসের সভা-ভঙ্গের পর, বাদসাহ তাঁহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"রাজপুত ওমরাহ! মুক্তিয়ারের হস্তে তোমার কন্যাকে সমর্পণ করায় আপত্তি কি?"

অরিসিংহ নম্রভাবে উত্তর করিলেন—"জাঁহাপনা! অন্য কেহ হইলে হয়ত উত্তর দিতে আপত্তি করিতাম। কিন্তু যখন আপনি আদেশ করিতেছেন, তখন বলিতে বাধা কি?" এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য সমস্ত খুলিয়া বলিলেন।

সাহজাহান দাম্ভিক ছিলেন বটে, কিন্তু একবারে ন্যায়বর্জ্জিত ছিলেন না। সমস্ত কথা আলোচনা করিয়া তিনি শেষে বলিলেন—"তোমার যাহা বিবেচনায় হয়, তাহা করিও, আমি এ বিষয়ে কোন অনুরোধ করিতে চাহি না।"

এই ঘটনার পর আর কেহ কখন অরিসিংহকে আমখাসে দেখে নাই।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই, অনসূয়ার পাত্র স্থির হইয়াছিল। অরিসিংহ ভাবিলেন, বিবাহ দিয়া ফেলিলেই সকল আপদ চুকিয়া যায়—সুতরাং তিনি শুভদিন দেখিয়া কন্যার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

জনরবে যখন দুর্জ্জয়সিংহের কাণে এই কথা উঠিল, তখন সেই উষ্ণমস্তিষ্ক রাঠোর—বিষধর-দষ্ট পান্থের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ক্রোধে ওষ্ঠাধর দন্তমর্দ্দিত করিয়া, তখনই মুক্তিয়ারের আবাসবাটীর দিকে ছুটিলেন।

তাঁহাদের গুপ্ত মন্ত্রণার শোচনীয় ফল পাঠক পর পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের দুই দিন মাত্র বাকী। অরিসিংহের অন্তঃপুর—আত্মীয় কুটুম্বগণের আগমনে কোলাহলময় হইয়া উঠিয়াছে। সকলে আনন্দোৎসব করিতে আসিয়াছে। কিন্তু কে জানে ইহার পরিণাম কি হইবে!

যাহার বাটীতে আনন্দ ধরে না, সে এক নির্জ্জন কক্ষে একখানি উন্মুক্ত পত্রের দিকে স্থিরদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখে ঘোর দুশ্চিন্তা! সেই প্রভাতকমলবৎ—সেই প্রাতঃশিশিরমণ্ডিত—শুভ্র মল্লিকা ফুলের ন্যায় ...দর মুখখানি বিষণ্ণতার ক্রীড়াক্ষেত্র হইয়া উঠিয়া...। পত্র পড়িতে পড়িতে বালিকার চক্ষে দুই ...এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া দেখা দিল।

অনসূয়া ভাবিল—“আমিই যত অনর্থের মূল। আমা হইতেই পিতার অবনতি, শত্রুবৃদ্ধি, মনের অশান্তি ও এত নির্য্যাতন। আমি যদি মরি, তাহা হইলে কি এ সব দুর্নিমিত্ত থামিয়া যায় না!”

এমন সময়ে অরিসিংহ কন্যার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি অনসূয়ার চক্ষে অশ্রু দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উঠিলেন—বলিলেন—“অনু! তুই কাঁদিতেছিস্?”

“না—বাবা—” বলিয়া সেই মুগ্ধা বালিকা পত্রখানি অরিসিংহের হস্তে দিল। পত্রখানি পড়িবার সময় রাজপুতবীরের মুখমণ্ডল মলিন-ভাব ধারণ করিল—তিনি সন্দিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—“অনসূয়ে! এ পত্র কোথা পাইলে?”

“এই বিছানার উপর।”

“এই ঘরে! এই বিছানার উপর!! কি আশ্চর্য্য! অন্তঃপুর মধ্যে ত শত্রু নিঃশঙ্ক ভাবে আসিতেছে!”

অরিসিংহ দ্রুতপদে গৃহত্যাগ করিলেন। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল—

"অনসূয়ে! সাবধান—অদ্য মধ্যরাত্রে বড় বিপদ ঘটিবে। তোমার পিতাকে লইয়া সন্ধ্যার সময় দুর্গ ত্যাগ করিও—" আশ্চর্য্যের বিষয় পত্রে স্বাক্ষর নাই!

* * * *

পত্র যাহার লেখা হউক না কেন—অরিসিংহের মনে দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়াইল, এসব শত্রুর প্রতারণা ও ভয়প্রদর্শন। তাই তিনি কন্যাকে বলিয়াছিলেন "অন্তঃপুরে শত্রুর যাতায়াত আরম্ভ হইয়াছে।"

কিন্তু তিনি এসম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। আর একবার তাঁহার নিজের নামে এই প্রকার একখানি পত্র আসিয়াছিল; কিন্তু তাহার পর কোন গোলযোগ ঘটে নাই বলিয়া, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও সতর্ক হইলেন না।

রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়াছে। প্রকৃতি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অরিসিংহের বিস্তৃত অট্টালিকার মধ্যে সকলেই সুখনিদ্রায় মগ্ন। নিস্তব্ধতা ও অন্ধকার পাশাপাশি হইয়া সেই গভীর নিশীথে পূর্ণরাজত্ব করিতেছিল।

এই অন্ধকারের মধ্যে—প্রচ্ছন্নভাবে শরীর ঢাকিয়া পঞ্চাশৎ পাঠান সৈন্য নিঃশব্দে অরিসিংহের প্রাসাদ-পার্শ্বস্থ আম্রকাননে প্রবেশ করিল। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া এক স্থানে দাঁড়াইল, যেন কাহার আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। এমন সময়ে একজন তাহাদের মধ্যে অস্ফুট স্বরে বলিল—"দুর্জ্জয়সিংহ! তুমি এই প্রাচীর-নিম্নে অপেক্ষা কর, আমি ক্ষুদ্র দ্বারের চাবি সংগ্রহ করিয়া আনি।" দুর্জ্জয়সিংহ অস্ফুট স্বরে বলিল—"চৌরের ন্যায় এ কার্য্য করিতে আমি প্রস্তুত নই, রাঠোর-বীর দস্যু নহে। আপনি থাকুন—আমি চলিলাম।"

"এখন রাগ করিলে চলিবে না, আচ্ছা তুমি

সম্মুখ হইতে আক্রমণ কর—আমার যাহা ইচ্ছা তাই করি।”

দুর্জ্জয়সিংহ এতক্ষণের পর নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। বৃথা ক্রোধের বশে কার্য্য করিয়া তিনি কতদূর অন্যায় করিয়াছেন, এতক্ষণ পরে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। এত অপমানের পরও তিনি অনসূয়াকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। সহজে তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবে না ভাবিয়া তিনি মুক্তিয়ারের সহিত এই ঘৃণাস্পদ সখ্যভাবে আবদ্ধ হইয়াছেন এবং তিনিই আবার অনসূয়াকে পত্র লিখিয়া সাবধান করিয়াছেন। মুক্তিয়ারের সহায়তার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া, কৃতজ্ঞতাসূত্রে অনসূয়া ও তাহার পিতাকে বাধ্য করিয়া, তাঁহাদের অনুগ্রহ লাভের ইচ্ছা, এখন দুর্জ্জয়সিংহের চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় পূর্ণ হইল না। দেখিলেন তাঁহার পত্র লেখা বৃথা হইয়াছে। অরিসিংহ কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন নাই। তিনি

অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনসূয়াকে শত্রুর-আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই এখন তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য দাঁড়াইল।

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মুক্তিয়ার—দুর্জ্জয়সিংহের মনোভাব মুহূর্ত্ত মধ্যে বুঝিয়া লইলেন। তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন—"ইহাকে বন্দী কর।" দুর্জ্জয়সিংহ আত্মরক্ষার চেষ্টা করিবার পূর্ব্বে তিনি পাঠানহস্তে বন্দী হইলেন। মুক্তিয়ার সৈন্য লইয়া ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া পুরী প্রবেশ করিলেন। ত্রিশজন সৈনিক তাঁহার পশ্চাৎবর্ত্তী হইল।

অরিসিংহ সেই গভীর কোলাহলের মধ্যে জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন—তাঁহার সৈন্যেরা উপরের পথে অরাতির প্রবেশ-সঞ্চার রহিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। তিনি দ্রুতপদে কন্যার গৃহাভিমুখে ছুটিলেন। অনসূয়াও গোলযোগে শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিয়াছিল। এক্ষণে পিতার স্বর শুনিয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

অরিসিংহ কন্যাকে দৃঢ় হস্তে ধরিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।

অনসূয়ায় গৃহের পরেই তাঁহার নিজগৃহ, তার পর "লাল-বারদোয়ারি" বা বাহিরের বৈঠকখানা। তখনও সেখানে শত্রুদল আসে নাই। তিনি কন্যাকে লইয়া বার-দোয়ারির উত্তর দ্বার দিয়া প্রস্থান করিবার চেষ্টা করিলেন। অনসূয়া এতক্ষণ স্থিরভাবে পিতার সঙ্গে আসিতেছিল—কিন্তু সহসা তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তন হইল। বালিকা কম্পিত কণ্ঠে বলিল—"পিতঃ! অপেক্ষা করুন, আমি একটী প্রয়োজনীয় জিনিষ আনিতে ভুলিয়াছি।"

অরিসিংহ উত্তর না করিতে করিতে অনসূয়া নিজের গৃহের দিকে ছুটিল। সে তাহার মৃতা জননীর শ্বেতমর্ম্মরাঙ্কিত ছবিখানি আনিতে ভুলিয়াছিল। অর্দ্ধপথ না যাইতে যাইতে মুক্তিয়ার খাঁ সদলে অনসূয়ার পথ রোধ করিলেন। অনুচরদের আদেশ করিলেন—"ইহাকে বন্দী

কর। কিন্তু সাবধান, যেন কেহ ইহার অঙ্গে হস্ত-স্পর্শ না করে।" পক্ষিণী পিঞ্জরাবদ্ধ হইল।

পিতা কন্যার বিলম্ব দেখিয়া তাহার ঘরের দিকে ছুটিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। মুক্তিয়ার অরিসিংহকে দেখিবামাত্র সবেগে তাঁহার দিকে ধাবমান হইলেন।

অরিসিংহ দৃঢ় হস্তে তরবারি ধরিয়া অব্যর্থ লক্ষ্যে চার পাঁচজন সেনানীকে সেইখানে ধরা-শায়ী করিলেন। তাঁহার উন্মত্তভাব ও সিংহের ন্যায় পরাক্রম দেখিয়া শত্রুসৈন্য পথ ছাড়িয়া দিল। পথ পরিষ্কার পাইয়া অরিসিংহ কন্যার নিকট উপস্থিত হইলেন। কন্যা তখন কাতর-কণ্ঠে নিরুপায়ভাবে বলিল,—"পিতঃ! রক্ষা করুন।" অরিসিংহ মুহূর্ত্তকাল কন্যার দিকে স্থির-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিলেন এবং পরক্ষণেই ঘোর উন্মাদের ন্যায় হাস্য করিয়া সেই অরাতি-রুধির-প্লাবিত তীক্ষ্ণ খড়্গ—প্রাণসম দুহিতার

বক্ষে আমূল প্রোথিত করিয়া উন্মাদের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—“বৎসে! তাহাই হউক; এস তোমাকে রক্ষা করি!” কোমলতাময়ী পুষ্প-প্রতিমা সেই নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন-লতিকার ন্যায় ভূতলে পড়িয়া গেল।

মুক্তিয়ার এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া দশ হস্ত দূরে পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সৈন্যগণ ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিল। রাজপুত প্রয়োজন মতে স্বহস্তে কন্যাকে বধ করিতে পারে, এ দৃশ্য তাহাদের নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল! অরিসিংহ বিষণ্ণ মুখে আহত কন্যাকে কোলে লইয়া দ্রুতপদে লাল-বারদোয়ারিতে পৌঁছি-লেন।

মুক্তিয়ার স্থির হইয়া এক দৃষ্টে এই ভীষণ কাণ্ড দেখিতেছেন, এমন সময়ে সহসা পশ্চাৎ-দিক হইতে একটী তীক্ষ্ণধার বর্শা আসিয়া তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিল। সেনাপতি ফিরিয়া দেখি-লেন, উন্মত্ত দুর্জ্জয়সিংহ একহস্তে তরবারি ও

এক হস্তে বর্শা লইয়া পাঠান-সেনা নিপাত করিতেছেন। মুক্তিয়ার সেই দৃঢ় আঘাতে ভূতলে পড়িলেন।

দুর্জ্জয়সিংহ শত্রুসৈন্য মথিত করিয়া অনসূয়ার অনুসন্ধানে ছুটিলেন। বারদোয়ারিতে প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন—সেই সদাপ্রফুল্ল শুভ্র কুসুমটী ছিন্নবৃন্ত হইয়া ভূতলে লুটাইতেছে। দুর্জ্জয়সিংহ এ দৃশ্যে মর্ম্মাহত হইলেন—কাতর স্বরে ডাকিলেন—"অনসূয়ে! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।"

কেহই উত্তর দিল না—সেই কুসুমললামভূতা কুলকন্যার দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপাখী তাহার পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে। দুর্জ্জয়সিংহ নিশ্চল ও স্থির দৃষ্টিতে সেই রুধির-প্লাবিত দেহযষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। একবার সেই রাজপুত-ধর্ম্ম-পরায়ণ উগ্রতেজা পিতার মুখের দিকে চাহিলেন, পরে ধীরস্বরে বলিলেন—"অনসূয়ে! প্রাণাধিকে! এই দুর্জ্জয়সিংহ—

রাঠোরকু-লকলঙ্ক, তোমার উপর যে দারুণ অত্যাচার করিয়াছে—মুক্তিয়ারের শোণিতে তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। যদি তোমাকে জীবিত পাইতাম, যদি তোমার মুখে দুটা তিরস্কারের কথাও শুনিতাম, তাহা হইলেও বুঝি বা তদপেক্ষা কঠোর প্রায়শ্চিত্তের দিকে চিত্ত ধাবিত হইত না।” এই কথা বলিয়াই দুর্জ্জয়সিংহ তীক্ষ্ণধার শাণিত ছুরিকা নিজ বক্ষঃ-স্থলে বসাইয়া দিলেন।

আর অরিসিংহ—হতভাগ্য অরিসিংহ—যাহা করিলেন, পাঠক পরে তাহার পরিচয় পাইবেন।

* * * * *

সন্ধ্যা হইয়াছে—আকাশে দুই চারিটী তারকা অনন্ত নীলবর্ণের মধ্যে উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিয়া যমুনার নীলবক্ষে আপনাদের জ্যোতি নিরীক্ষণ করিতেছে—এমন সময়ে রাজপথে ঘোরতর বাদ্য-কোলাহল উঠিল। চারিদিকে

মশালের আলো, গভীর বাদ্যধ্বনি, তাহার মধ্যে জনরব—"ঐ বর আসিতেছে।"

বর আসিয়া, অরিসিংহের প্রাঙ্গণের কাছে থামিল। আশপাশের লোক—যাহারা পথিমধ্যে বরের সঙ্গে জুটিয়াছিল—দুর্গাধিপতির প্রাসাদের দিকে বরকে যাইতে দেখিয়া তাহারা থামিয়া পড়িল। দ্বারের নিকট আসিয়া বাদ্যোদ্যম বন্ধ হইল, নহবত থামিল; মশালের আলো নিবিয়া গেল। বর সকলকে বাহিরে রাখিয়া বিস্ময়ান্বিত চিত্তে পুরী প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্ব রাত্রে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানেন না। বিবাহ-বাড়ীতে আলো নাই—কোলাহল নাই—বাদ্য নাই—বিবাহ-সভা নাই—দেখিয়া তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

বর স্তম্ভিত হইয়া উপরে উঠিলেন। বাটীর পুরাতন ভৃত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল—সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

সহসা অরিসিংহ আসিয়া সেই স্থানে

দেখা দিলেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয় কোটরমগ্ন, মুখে ঘোর বিভীষিকা—বদনমণ্ডল শবের ন্যায় মলিন। বরকে দেখিয়া তিনি উন্মাদের ন্যায় কঠোর হাস্য করিয়া উঠিলেন। দৃঢ়হস্তে চৌহান-রাজকুমারের হস্ত ধরিয়া দ্রুতপদে তাহাকে "লাল-বারদোয়ারিতে" লইয়া গেলেন।

চৌহানকুমার দেখিলেন—গৃহটী পূর্ণরূপে উজ্জ্বলিত। দর্পণে দর্পণে, ঝাড়ের দলে দলে সেই আলোক প্রতিফলিত হইয়াছে। চারিদিকে ফুলের মালা—হর্ম্ম্যতলে ফুল—উপরে ফুল—চারিদিকে ফুল! এই ফুলরাশির মধ্যে বহুমূল্য কারুকার্য্যময় মখমল আস্তরণে আবৃত কোন পদার্থ রহিয়াছে। অরিসিংহ বক্রদৃষ্টি করিয়া সেই মখমলের আবরণ ধীরে ধীরে উঠাইলেন। চৌহানকুমার সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখিয়া দশহস্ত পিছাইয়া আসিলেন, তাঁহার মুখ শবের ন্যায় মলিন হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয়! একি?"

অরিসিংহ বলিলেন—"বৎস! ইহা রাজপুতের বিবাহ। অনসূয়া ইহলোকে তোমার জন্য অপেক্ষা করিতে পারিল না। পরলোকে তোমার সহিত মিলিবে।"

অরিসিংহ গম্ভীরভাবে স্নেহ-উচ্ছলিত হৃদয়ে অনসূয়ার শবদেহ চুম্বন করিলেন—পরে বিকট হাস্য করিয়া লাল-বারদোয়ারি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। জনপ্রবাদ—উন্মাদগ্রস্ত দুর্গাধিপতিকে সেই অবধি সেখানে আর কেহ দেখে নাই।
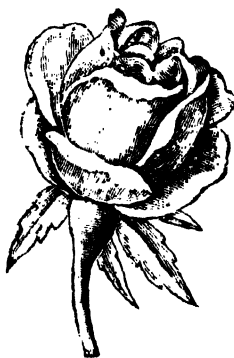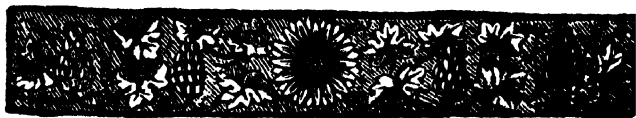
কল্যাণী-মন্দির।

কল্যাণী-মন্দির।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"কি আশ্চর্য্য! কা'ল চন্দ্রপতির স্ত্রীকে কে হত্যা করিয়া গিয়াছে।"

"এই দুইদিন না যাইতে যাইতে আবার এই কাণ্ড? সে দিন ত সুখলালের স্ত্রীকে—একজন সৈনিক জোর করিয়া য়া লইয়া গেল"—

"ওহে—তাও জান না—তার তিন দিন পূর্ব্বে আবার আমাদের বৃদ্ধ মসরুকে কে নৃশংস-

রূপে হত্যা করিয়া গাছের ডালে বাঁধিয়া দিয়াছিল। তাইত—ভাই! কেমন করিয়া আর স্ত্রীপুত্র লইয়া দেশে থাকা হয়? এখানে জন্মিয়াছি, এখানে মানুষ হইয়াছি—এখানে জমীজারাত করিয়াছি। এখন যাই কোথায় বল দেখি?”

উল্লিখিত ভাবে কথোপকথন করিতে করিতে আট দশ জন লোক ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদের মধ্যে অনেকেরই মুষ্টি দৃঢ় সম্বদ্ধ হইল, অনেকেই কোষস্থ তরবারিতে অন্যমনস্ক ভাবে হস্ত প্রদান করিল। কেহ বা সম্মুখস্থ বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিল।

যাহারা সেই মঙ্গলা নদীর তীরে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছিল, তাহাদের সকলেই পূর্ব্বতন “ভূমি-আওয়ৎ” রাজা ওঁঙ্কন সিংহের প্রজা।

মঙ্গলা নদী—ক্ষীণ স্রোতোমালা হৃদয়ে

ধরিয়া, যশল্মীরের পাষাণ-বক্ষপ্লাবিত করিয়া, ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। অদূরে নূতন দুর্গাধিকারীর প্রকাণ্ড পার্ব্বত্য দুর্গ—তাঁহার ক্ষমতার বিজয় নিশানস্বরূপ—স্কন্ধ তুলিয়া রহিয়াছে।

তখন রাজপুতেরা—এক এক সামন্তের অধীনে প্রজাস্বরূপে বসবাস করিত।

তখন ভূমির দখলী-স্বত্বের সম্বন্ধে কোন একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। জমীর উপর কোন সামন্তের নির্দ্ধারিত স্বত্ব ছিল না। যাঁহার লোক-বল অধিক হইত—তিনিই বাহু-বলে অপর সামন্তের জমী কাড়িয়া লইয়া পূর্ব্বাধিকারীকে তাড়াইয়া দিতেন।

এবারও তাই হইয়াছে। পূর্ব্বাধিকারী সামন্ত রাজা সুজনসিংহ—সর্দ্দার দুর্জ্জনসিংহ নামধারী এক রাঠোরের দ্বারা তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিকার হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বদিনে ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, আজ তিনি পথের ভিখারী হইয়াছেন।

দুর্জ্জনসিংহ—দুর্দ্দান্ত সামন্ত। তিনি এখনও প্রজা বশ করিতে পারেন নাই। তাঁহার দাম্ভিকতায় প্রজারা সকলেই অসন্তুষ্ট। এমন কি, প্রাচীনেরাও বলিয়াছিল—এমন দুর্দ্দান্ত "ভুমি-আওয়ৎ" তাহারা কখনও দেখে নাই। একে দুর্জ্জনসিংহের ভীষণ অত্যাচার ও লুটপাট, তাহার উপর আবার দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিল। দুর্জ্জনসিংহ প্রজার মুখের দিকে চাহিলেন না। কে কোথায় অনাহারে পড়িয়া রহিল—তাহা না দেখিয়া, তিনি স্বীয় রাজভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিতে ব্যস্ত।

প্রজারা দল বাঁধিয়া একদিন দুর্গদ্বারে দুঃখ জানাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল। দুর্জ্জনসিংহ প্রহরীদের দুর্গদ্বার আবদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। সেই দিন হইতে বড় বড় "ভুমি-য়ারা" বিদ্রোহীর মত হইল।

ইহার উপর আবার নূতনবিধ অত্যাচার। গৃহস্থলোকে দুর্জ্জনের উদ্ধত সৈনিকদিগের ভয়ে

স্ত্রীপুত্র লইয়া বাস করা ভার বোধ করিল। কাহারও ঘরে সুন্দরী স্ত্রী দেখিলে—সৈনিকেরা আসিয়া বলপূর্ব্বক প্রবেশ করে। এ প্রকার ঘটনায় দুই এক স্থলে দুই একটা খুন জখমও হইল, শেষ কথাটা দুর্গাধিপতির কাণে উঠিল। তিনি নিজে সৈনিকদের বিশেষ দোষের প্রমাণ পাইয়াও নির্দ্দোষীদিগের কারাগারে দিলেন। প্রজারা আরও ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহার উপর আবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ। ভূমিয়ারা মরে মরুক, দুর্জ্জন তাঁহার সৈনিকদিগের জন্য চড়া দামে গ্রামের সমস্ত শস্য ক্রয় করিয়া দুর্গমধ্যে পূরিলেন। যাহারা শস্য বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না, তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল।

যতদিন ঘরে শস্য ছিল, ততদিন প্রজারা দুবেলা খাইয়াছিল। ভাণ্ডারে টান পড়িলে, এক বেলা খাইল। যাহাদের অবস্থা ভাল, তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া দু'বেলা খাইত। নিম্নশ্রেণীর লোকের তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। তাহারা

বনের শাক কচু তুলিয়া, সিদ্ধ করিয়া খায়। কোন দিন বা নিরম্বু উপবাস করে, কোন দিন বা সবলে দুর্ব্বলের অন্ন কাড়িয়া খায়। কেহ বা অপরে খাইতেছে চাহিয়া দেখে— কেহ বা স্ত্রীপুত্রের কঠোর ক্ষুধার যাতনায় আত্মহারা হইয়া পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়, আর সকলেই নিষ্ঠুর দুর্গাধিপতিকে অভিশাপ প্রদান করে।

একদিন এই বুভুক্ষু প্রজার দল, ক্ষীণ-শরীর-ভার কষ্টে বহন করিয়া, দুর্গাধিপতিকে দুর্ভিক্ষের সংবাদ—তাহাদের অনাহারের সংবাদ জানাইতে গিয়াছিল। কিন্তু দুর্দ্দান্ত দুর্জ্জনসিংহ স্বীয় ভৃত্যাদিগকে কতকগুলা ভুক্তপাত্রাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট অন্ন, অস্পর্শনীয় স্থলে নিক্ষেপ করিতে হুকুম দিলেন। বলিয়া দিলেন—"ক্ষুধিত কুকুর-গুলাকে এই সুপাচ্য উচ্ছিষ্ট অন্ন দিয়া পুষ্টি লাভ করিতে দাও।" সে হতভাগ্যেরা সেই দিন হইতে প্রতিকারের ভার ঈশ্বরের উপর

সমর্পণ করিল। ইহার উপর আবার নিত্যই খুন জখম। তাই কতকগুলি প্রজা একত্র হইয়া মঙ্গলাতীরে এত গোলযোগ আরম্ভ করিয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এইরূপ দুর্ভিক্ষের সময় যোড়শবর্ষীয় যুবক কিরণসিংহ—তাহার পীড়িতা মাতার জন্য বহু-কষ্টে অল্প গোধূম সংগ্রহ করিয়া, তাহাতে এক খানি রুটী প্রস্তুত করিল। অনাহার-ক্লিষ্টা বৃদ্ধা মাতার নিকট আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মা! দেখ আজ কি আনিয়াছি?"

বৃদ্ধা বলিল—"কি বাবা! এ রুটীখানি কোথায় পাইলি? তুই আজ দুই দিন পেট ভরিয়া খাইতে পা'স নাই। তুই ঐখানি খা।"

"না—মা! আমি খাইয়াছি, এখানি তোমার। মা! তোমার যে একমাস রোগের পথ্য হয় নাই!"

বালক রুটীখানি চারি খণ্ড করিয়া, তাহার তিন ভাগ মাতার জন্য রাখিল। এক ভাগ তাঁহাকে তখনই খাওয়াইল। আর এক ভাগ লইয়া সে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাকে বলিল—"এ ভাগটী কার জান ?"

"না—বাবা ! কার বল্ দেখি !"

"কেন—মা, যে তোমাকে নিজের শরীরের রক্ত দিয়া পোষণ করিতেছে—যে তোমার এই ভীষণ রোগে, এই অকাল মন্বন্তরের মধ্যেও আহার দিয়া রাখিয়াছে—যাহার জন্য আজও আমি তোমার সেবা করিতে পাইতেছি, এখানি তাহাকেই দিব।"

কুঞ্চিত কেশগুলি দোলাইতে দোলাইতে, দুই মুঠার ভিতর সেই টুক্‌রা রুটীখানি লইয়া, বালক প্রাঙ্গণের এক কোণে চলিয়া গেল। বিশ হাত দূরে এক ক্ষুদ্র মৃৎ-কুটীরের আগড় ঠেলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে করুণ স্বরে কোন জীব ডাকিয়া উঠিল—"মা—মা"; যুবক

বলিল—"হাঁরে কল্যাণ! আমি কি তোর মা!" সেই বাক্‌হীন পশু যেন সে কথা বুঝিতে পারিয়া একবার আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। কিরণ তাহার যুক্ত অঞ্জলি, তাহার মুখের কাছে ভূমির উপর মুক্ত করিয়া দিল। আর সেই বন্যছাগী, মহানন্দে লাফাইতে লাফাইতে, মাথা নাড়িতে নাড়িতে, একটু একটু করিয়া সেই রুটীর টুকরা শেষ করিল। কিরণ দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া স্নেহ-বিপ্লুত স্বরে বলিল—

"কল্যাণি! আজ তবে তুই থাক। দেশে ঘাস নাই, কূয়ায় জল নাই, তোকে ঘাস জল খাওয়াইতে পারিলাম না—এই বড় কষ্ট। কাল তুই আমায় একটু বেশী দুধ দিস্। যার জন্য রুটি রাখিয়াছি।" সরলহৃদয় কিরণ ভাবিয়াছিল, দুধ দেওয়াটা যেন কল্যাণীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সবে মাত্র আগড়টী বন্ধ করিয়া, কিরণসিংহ উঠানে নামিয়াছে, এমন সময়ে বাহিরে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা ও বাহিরের দ্বারের কাছে চার পাঁচ জনের পদধ্বনি হইল। দ্বারের উপর দমাদম্ ঘা পড়িতে লাগিল। বাহির হইতে এক-জন পরুষকণ্ঠে বলিল—"কিরণসিংহ! দোয়ার খোল—"

কিরণ একটু ভয় পাইয়াছিল। ভাবিল—এরা একবারে আসিয়া দ্বার ভাঙ্গিতে চায় কেন? কিরণ ধীরে ধীরে বলিল—"দ্বার খুলিতেছি। খামকা—দ্বারটা যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে! কে হে তোমরা?"

"তোমার যম—খোল, শীঘ্র দ্বার খোল।" আবার দমাদম্ ঘা পড়িতে লাগিল।

যুবক কিরণসিংহ দ্বার খুলিয়া দিবামাত্রই একজন লোক কঠোর ভাবে অন্যকে বলিল—

"কই! কে তোমার কিরণসিংহ—দেখাইয়া দাও।"

কিরণসিংহ দেখিল, তাহাদের সকলেই দুর্গাধিপতির লোক। কেবল একজন তাহার প্রতিবেশী। সেই দেখাইয়া দিল—এই সেই নরপিশাচ কিরণসিংহ। একজন রক্ষী পরুষস্বরে বলিল—"কিরণ! তুমি আমার বন্দী।"

"বন্দী? কেন আমি কি করিয়াছি? কি অপরাধে আমি বন্দী?"

"তোমার নিকট আমরা তাহার জবাবদিহি করিতে চাহি না। দুর্গাধিপতির আদেশ লঙ্ঘন করিয়া তুমি রাজ-বিদ্রোহী হইয়াছ। বিদ্রোহের দণ্ড—তোমার জীবন-নাশ। দুর্গাধিপতির নিকট তোমার বিচার হইবে।"

অপরাধটা কি—কিরণ কিছু জানিতে পারিল না। অথচ বিষয়টা গুরুতর। এই পৃথিবীতে দুষ্কর্ম্ম বলিয়া কোন একটা পদার্থ সে জানিত না। সেই কিশোর বয়সে "বিদ্রোহ" কথাটা

সে অভিধানের বহিতে কেবল দেখিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিল—ইহারা হয়ত আমায় ভ্রমক্রমে ধরিয়াছে। দুর্গাধিপতির সম্মুখে সে তাহাদের ভ্রমভঞ্জন করিয়া দিবে। আশায় উৎফুল্ল হইয়া, সে নীরসহাস্যের সহিত এক প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আচ্ছা, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু একবার আমার মা'কে দুটা কথা বলিয়া আসিতে দাও—"

"আর তোর মাকে কোন কথা বলিতে হইবে না" এই কথা বলিয়া, তাহারা ধাক্কা দিয়া কিরণসিংহকে দুর্গের দিকে টানিয়া লইয়া চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে—দুর্গাধিপতি দুর্জ্জয়সিংহ বিচারাসনে উপবিষ্ট। দলে দলে স্বপক্ষ ও

বিপক্ষ ভূমিয়ারা দুর্গাধিপতির বিচার দেখিতে আসিয়াছে। অপরাধও বিচিত্র, অপরাধীও বিচিত্র। বিচারটা কি হয়, দেখিবার জন্য অনেকেই প্রস্তর-প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গের অপ্রশস্ত দালানে আসিয়া জমিয়াছে।

দুর্গাধিপতির সম্মুখে কিরণসিংহ বন্দীভাবে দণ্ডায়মান।

দুর্গের বাহিরে বধমঞ্চের উচ্চ শিখর—উন্মুক্ত বাতায়ন-পথে—সে একবার মাত্র দৃষ্টি করিয়াছে। তাহাতেই তাহার প্রাণ শিহরিয়া উঠিয়াছে। সে নিজের জন্য তত চিন্তিত নহে। সে মরিলে তাহার মা'র কি হইবে, তাই ভাবিয়া সে আকুল। দুর্গাধিপতি—সভার নিস্তব্ধ ভাব প্রথমেই ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি গভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—"যুবক! তোমার নাম কিরণ-সিংহ?"

"হাঁ—মহারাজ!"

"তোমার অপরাধ কি জান?"

"আগে জানিতাম না—সম্প্রতি শুনিয়াছি।"

"তুমি আমার ঘোষণা অমান্য করিয়াছ। রাজাদেশ লঙ্ঘনে, বিদ্রোহ—বিদ্রোহীর পরিণাম প্রাণদণ্ড। তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

"আমি তাহাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। কিন্তু—আমার মা—" যুবক আর বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষে অশ্রু দেখা দিল।

দুর্গাধিপতি বলিলেন—"তোমার মার কি হইয়াছে?" কিরণ অশ্রু-প্লুত-নেত্রে বলিল—"আমার মা পীড়িতা—এক মাস ধরিয়া রোগে, শোকে, দুর্দ্দশায়, অনাহারে জর্জ্জরিতা; তাঁহাকে কে দেখিবে!"

দুর্গাধিপ বলিলেন—"কিন্তু তাহা বলিয়া তোমার অপরাধ মার্জ্জনা হইতে পারে না। তুমি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ। যে রুটী মানুষে না খাইতে পাইয়া মরিয়া যাইতেছে, যাহার মুখ আমি নিজে অনেক সময় দেখিতে পাই

না, তাহা তুমি কি না—একটা সামান্য ছাগীকে খাওয়াইয়া পরিতৃপ্ত হইলে?”

যুবক রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—“দুর্গাধিপতি! সেই ছাগী দুগ্ধ দিয়া এপর্য্যন্ত আমার মাতার রুগ্ন জীবন রক্ষা করিয়া রাখিয়াছে। সে না থাকিলে, এই অনাহারে আমার মা এতদিনে মরিয়া যাইতেন। দেশ জ্বলিয়া গিয়াছে—মাঠে ঘাস নাই, জলাশয়ে জল নাই,—সে ঘাস জল না খাইয়াও আমার মাকে দুধ যোগাইয়াছে। আমি মাতৃসেবার প্রধান সহায় ভাবিয়া, তাহাকে সামান্য একখণ্ড রুটী নিজে না খাইয়া দিয়াছি, তাহা কি রাজ-বিদ্রোহিতা!”

“যুবক! আমি পাষাণ নহি। সদ্‌গুণের আদর করিতে আমি জানি, কিন্তু আমার আদেশের একটুও এদিক ওদিক করিতে জানি না। আমার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড—”

কথাটা শেষ হইল না। দুর্গদ্বারে একটা ভয়ানক কোলাহল জাগিয়া উঠিল। ভিড়

ঠেলিয়া, জন কতক লোক প্রবেশ করিল। ধরা-ধরি করিয়া কি একটা রক্তাপ্লুত জিনিষ সেই সভার মাঝখানে দমাস্ করিয়া ফেলিয়া দিল। সকলে সভয়ে, বিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল—একটী ছিন্নশির বৃহদাকার বন্যছাগী। কেহ এ নৃশংস ব্যাপারের কিছু অর্থ বুঝিল না। কিন্তু কিরণ-সিংহ তাহা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে সহসা একবার চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল। নীরবে তাহার নেত্র দিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল।

দুর্গাধিপতি বুঝিলেন—কিরণসিংহেরই ছাগী নিহত। তিনি রহস্য করিয়া তাহাকে কি বলিতে যাইতেছেন—এই সময় বাহিরে ভীষণতর আর একটা কোলাহল উঠিল। সেই কোলাহলের মধ্যে "জয় সুজনসিংহ কি জয়" এই কথা ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুর্গাধিপতি চমকিয়া উঠিয়া, সিংহাসন ছাড়িয়া, বাতায়নপথে দাঁড়াই-লেন। দেখিলেন সুজনসিংহের নেতৃত্বে, বিদ্রোহী সেনাদল দুর্গে প্রবেশ করিতেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সুজনসিংহের কতক সৈন্য দুর্গপ্রবেশ করিয়াছে। উপায়বিহীন দুর্জ্জনসিংহ দুর্গের জলপ্রণালী উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বাহিরের সৈন্যাগম বন্ধ করিয়া দিলেন। সুজনসিংহ, অসম ...শ... ভর করিয়া সসৈন্যে সন্তরণ দিয়া ক্ষর প্রবল করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিং কে বেতন তীর হইতে অসংখ্য সৈন্য তাঁহাদের তাহারা চালাইতে লাগিল। তাঁহার অনেক সৈন্য স্ত্রীপুত্র হইয়া ভূশায়ী হইল। তিনিও আর বুঝি জকে হইতে জীবিত উঠিতে পারেন না। সহসা উন্মত্ত ভাবে অসি সঞ্চালন করিতে করিতে এক যুবক বজ্র-নির্ঘোষে কহিল "অগ্রসর হও—নহিলে এখনি মৃত্যু!" সৈন্যদিগের মধ্যে একটা আতঙ্ক পড়িয়া গেল, তাহাদের কেহ কেহ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া সহসা স্তম্ভিত ভাবে রহিল—কেহ বা অস্ত্র ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। অবসর পাইয়া

সুজনসিংহ পরপারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বাসী সৈন্যের অনেকে উপরে উঠিয়া দুর্জ্জনসিংহের সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল। সুজনসিংহ, দুর্জ্জনসিংহের অন্বেষণে ধাবিত হইলেন। কিরণসিংহ অস্ত্র চালাইতে ব্যাপৃতে তাঁহার সহগামী হইয়া ভীমস্বরে সিংহ তাঃ-"ক্ষুধাতুর! জীর্ণ শীর্ণ পীড়িত প্রজা-চীৎকার িমরা এ দুর্গ দখল কর, বল—সুজন-নেত্র দিগ্‌জয়।" সুজনের প্রভুভক্ত সেনারা

ঃসাহে আনন্দে হুঙ্কার করিল—"জয় সুজন-সিংহের জয়।" আরও এক আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিতে দেখিতে দুর্জ্জনের সমস্ত সেনা সুজনের পক্ষ গ্রহণ করিল। দুর্জ্জন পরাজিত হইলেন। কিরণসিংহের সাহায্যে দুর্গ পুনরায় সুজনের অধিকারগত হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দুর্জ্জনসিংহ যদি অত্যাচারী না হইত, তাহা হইলে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী দুর্গাধিপতি রাজা সুজনসিংহ এত সহজে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতেন না। দুর্জ্জনের সেনারা প্রভুর নিমক খাইত—কিন্তু তাহার রূঢ়-ব্যবহারে তাহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষের প্রবল প্রকোপের সময়, দুর্জ্জনসিংহ তাহাদিগকে বেতন স্বরূপ একটী পয়সাও দেয় নাই। তাহারা দুর্গাধিপের সামান্য প্রজা। তাহাদেরও স্ত্রীপুত্র ছিল—তাহাদেরও গ্রাসাচ্ছাদন ছিল। এদিকে বেতন নাই, আবার অন্যপক্ষে দুর্জ্জনসিংহ বাজারের সমস্ত শস্য কিনিয়া লইয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিতেছে। শস্যমাত্র নাই। সাধারণ প্রজারও যেরূপ অনাহারে মৃত্যু, রাজার নফর হইয়া তাহাদেরও তাই!

তাহা ছাড়া—তাহাদের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্ব দুর্গাধিকারী সুজনসিংহের অনুরাগী ছিল।

সুজনসিংহের সদয় ব্যবহার, পুত্রোপমে অনাবিল স্নেহ, নির্ম্মৎসরতা, সরলতা, অমায়িকতা, তাহারা ভুলে নাই। কেবল পেটের দায়ে, শাসনের ভয়ে তাহারা দুর্জ্জনের চাকরী স্বীকার করিয়াছিল। যখন তাহারা দেখিল—অত্যাচারীর দারুণ অত্যাচারে সমস্ত গ্রাম্য প্রজাদল বিদ্রোহী হইয়াছে—পূর্ব্ব দুর্গাধিপতি সুজনসিংহের সূর্য্যচিহ্নিত পতাকার অনুসারী হইয়াছে—তখন তাহারাও পূর্ব্ব প্রভুর সহায়তায় মনঃস্থির করিল।

তাই কিরণসিংহ অত সহজে দুর্গোদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। কিরণসিংহ ও সুজনসিংহ উভয়েই যখন দেখিলেন—সেনারা নূতন দুর্গাধিপতির অন্নে শরীর পুষ্ট করিয়াও পরিখার পরপারে কোন বিশেষ বাধা দিতেছে না, তাঁহারা অতি সহজেই বুঝিলেন—ব্যাপারটা তাঁহাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্পূর্ণ অনুকূল। কাজেই বিনা বাধায় তাঁহারা জলপ্লাবিত পরিখা পার হইলেন।

পাপিষ্ঠ দুর্জ্জনসিংহ যখন দেখিল—তাহার সেনারা যুদ্ধকার্য্যে আর তত উৎসাহী নহে, সম্মুখে শত্রু পাইয়াও তাহাদের কৃপাণ কোষ-বিমুক্ত করে নাই—তখন দুর্গরক্ষা দুরূহ ব্যাপার জানিয়া, পাপিষ্ঠ আত্মরক্ষায় সচেষ্ট হইল। সে বুঝিল, পলায়নই শ্রেয়ঃ! অতি অত্যাচারী—প্রায়ই অতি কাপুরুষ হয়। দুর্জ্জনসিংহ পলা-ইতে গিয়াও পলাইতে পারিল না।

দুর্জ্জনসিংহ যখন দেখিল, অরাতিসৈন্য জলপূর্ণ, স্রোতঃপ্লাবিত পরিখা উত্তীর্ণ হইয়া, বাহিরের প্রাঙ্গণে সমাগত হইয়াছে, তখন সে উন্মাদের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নিজ গুপ্তগৃহে যাহা কিছু মণি মুক্তাদি ছিল, তাহা সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে পাপিষ্ঠ যেমন অগ্রসর হইতেছে—অমনি দেখিল—সম্মুখে দেবীনিন্দিত অপ্সরঃকান্তি স্বর্ণপ্রতিমা!

দুর্জ্জনসিংহ কাতর কণ্ঠে বলিল—"মদা-লসা! আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমার

পাপের প্রায়শ্চিত্তের সময় উপস্থিত। তোমার উপর, এই ক্ষুদ্র রাজ্যের উপর, আমার মুখপ্রেক্ষী প্রজাপুঞ্জের উপর, আমি এতদিন যে অত্যাচার করিয়াছি, আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। তোমার পিতা—আর সেই কিরণসিংহ, আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছে। কাল এ দুর্গ আমার ছিল—এখন আর আমার নাই।”

সেই দেবীপ্রতিমা—দুর্জ্জনসিংহের এ কাতরোক্তিতে একটুও—টলিল না। স্থিরভাবে বলিল—“দুর্জ্জন! এতদিন তুমি বুঝিতে পার নাই, মানুষের শক্তি কিছু নয়। উপরে এক মহা-শক্তিমান আছেন, তাঁহার অমিতশক্তির তুলনায় মানুষ তৃণবৎ-লঘু। যে জন্য তোমার এত অনু-তাপ, তাহা আগে বুঝিতে পারিলে বোধ হয় আজ এত কাতর হইতে না।

সহসা বাহিরে আবার বিজয়ী সেনাগণের “জয় সুজনসিংহের জয়”—এই ভীষণনাদ, বজ্র-নির্ঘোষবৎ পলায়ন-পরায়ণ দুর্গাধিপতির কর্ণে

প্রবেশ করিল। সে পাপিষ্ঠ, সে ভীষণ জয়-কোলাহলে শিহরিয়া উঠিল। সে কাতরকণ্ঠে বলিল—"মদালসা! তোমার জন্যই এ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। যদি না তোমায় মহেশ্বর-মন্দিরে দেখিতাম, তাহা হইলে আজ আমায় এ দুর্গ ত্যাগ করিতে হইত না। যখন তোমার হস্তপ্রার্থীরূপে ছয় মাস পূর্ব্বে, এই প্রাসাদের মধ্যে তোমার পিতার নিকট উপস্থিত হই, তখন তিনি আমায় "মেষপালকের পুত্রের সঙ্গে ভুমিয়াদিগের অধীশ্বর, রাজা সুজনসিংহের কন্যার বিবাহ হইতে পারে না" বলিয়া প্রত্যাখ্যাত করিয়াছিলেন। সেই অপমানে উত্তেজিত হইয়াই আমি সেনা সংগ্রহ করিয়া প্রতিহিংসাবশে এই দুর্গ দখল করি। ছয় মাস তোমায় অবরুদ্ধ রাখিয়াছি, কিন্তু সত্য বল দেখি—মদালসা! আমি তোমায় বন্দী করিয়াও রাজরাণীর মত রাখিয়াছি কি না?

মদালসা কোন উত্তর করিল না। নতমুখে কি ভাবিতে লাগিল।

সুজনসিংহ বলিল—"আর সময় নাই। আমি এখন পলায়ন করিতেছি। বাহিরে আমার বিশ্বস্ত ভৃত্য অশ্ব সজ্জিত রাখিয়াছে। তুমি আমার সঙ্গে এস।"

মদালসা মরালগ্রীবা উন্নত করিয়া বলিল—"পাপিষ্ঠ! পাপমুখে একথা বলিতেও তোমার সাহস হইল! তোমার সম্মুখে মৃত্যু—তবুও দারুণ পাপে অগ্রসর!"

বিলম্ব সহে না। বহিঃপ্রাঙ্গণের কোলাহল ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইতেছে। দুর্জ্জনসিংহ চরিত্রবান ছিল না, বিবাহিতও ছিল না। অন্তঃপুরে অন্তঃপুরিকারূপিণী তাহার বিলাসদাসীরূপে যাহারা এতদিন রাজত্ব করিতেছিল, তাহারা ইতিপূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছে! সেই অন্তঃপুরে কেবল মদালসা ও দুর্জ্জনসিংহ একা।

পাপিষ্ঠের প্রাণে মদালসার সেই উন্নত-

গ্রীবাভঙ্গী, আরক্তিম-গণ্ডরাগ, সংসর্পিত সুকৃষ্ণ কেশরাশি, উজ্জ্বল কৃষ্ণ-তারকাময় চঞ্চল নেত্রে সে সময়েও ঘোর বিলাস-বাসনা আনিয়া দিল। দুর্জ্জনসিংহ মনে মনে ভাবিল,—ইহাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাই। সহজে অনুনয় বিনয়ে, এ গর্ব্বিতা স্ত্রীলোককে আয়ত্ত করা ও আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি অসম্ভব। আর, ইহার পিতার অদ্যকার এ দুষ্কর্ম্মের প্রতিশোধ লওয়ার আর অন্য কোন উপায় নাই।

দুর্জ্জন, ভীমমূর্ত্তিতে মদালসার পুষ্পকোমল হস্ত ধারণ করিল। সে স্পর্শে, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সুন্দরী মদালসা, সবলে হস্ত ছাড়াইয়া লইয়া, দুর্জ্জনকে পদাঘাত করিলেন। দুর্জ্জনসিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া নিষ্ঠুরের ন্যায়, পিশাচের ন্যায়, মদালসার কুঞ্চিত কেশ-রাশি ধরিল। ইচ্ছা—সবলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। সে পিশাচ, আকাঙ্ক্ষার উত্তে-জনায়, অপমানে, মনস্তাপে উন্মাদবৎ হইয়াছে।

তাহার নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছে!

দশানন অনেক পাপ করিয়াছিল। কিন্তু তাহার শেষ পাপ সীতাহরণ। ইহাতেই তাহার দশাননত্ব-লোপ। দুর্জ্জনসিংহও অনেক পাপ করিয়াছিল; কিন্তু মদালসার পবিত্র অঙ্গে হস্তার্পণই তাহার শেষ পাপ।

মদালসা অনন্যোপায় হইয়া, বিদ্যুৎগতিতে গৃহ প্রবেশ করিয়া দ্বারবন্ধ করিল। দুর্জ্জনসিংহ ক্রমাগত পদাঘাতে সে দ্বার ভাঙ্গিতে পারিল না।

সহসা বাহিরের সৈনিকদের, অন্তঃপুর-প্রবেশ পদশব্দ শ্রুত হইল। সাত আট জন সেনানী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে আসিয়া, সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। দুর্জ্জনসিংহের আর পলাইবার পথ রহিল না। সেনাদলের সর্ব্বাগ্রে কিরণসিংহ। কিরণসিংহ—ঘৃণার সহিত বলিলেন—"নরাধম! তোমার জীবন ভিক্ষা দিতেছি—মদালসা কোথায় আছে বলিয়া দাও।"

পাপিষ্ঠ অম্লান বদনে বলিল—"মদালসা মরিয়াছে। আমি তাহাকে হত্যা করিয়াছি।"

কিরণসিংহ তীব্রবেগে দুর্জ্জনসিংহের গলদেশ ধারণ করিলেন। সেই যুবকের শক্তি, যেন অত বড় দুর্দ্দান্তকে নিতান্ত শক্তিহীন করিয়া তুলিল। সৈনিকবৃন্দ কিরণসিংহের আদেশে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বন্দী করিল।

কিরণসিংহ মদালসাকে কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। সম্ভাবনাও ছিল না। মদালসা রাজ-অন্তঃপুরে সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা। কিরণ দীন দুঃখী দরিদ্র। মদালসার পিতা সুজনসিংহ কেবল তাঁহাকে বলিয়া দিয়াছেন—"বৎস! আমার কন্যাকে উদ্ধার করিও। সে অন্তঃপুরে দুর্জ্জনসিংহের বন্দী।"

মদালসা—গৃহমধ্য হইতে সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিল। সে ধীর গতিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল। কিরণসিংহ সবিস্ময়ে দেখিলেন—যেন সেই গৃহকক্ষ হইতে কোন

অপ্সরা তাঁহাকে আশ্বাস দিতে আসিয়াছে। কিরণ নম্রভাবে বলিলেন—"আমরা যাঁহাকে খুঁজিতেছি, আপনি কি সেই?"

মদালসা সানন্দে বলিল—"আপনার অনুমান সত্য।"

মদালসা কিরণসিংহের সুন্দর কান্তি, সারল্যমণ্ডিত উদ্‌ভ্রান্ত-মুখমণ্ডল, সরলতাপূর্ণ মুখশ্রী দেখিয়া মনে মনে ভাবিল—"হায়! সৃষ্টিকর্ত্তা ত একই! তবে তাঁহার সৃষ্ট মানব—কেহবা পশু, কেহবা দেবতা হয় কেন? কেহবা অপ্সর, কেহবা পিশাচ হয় কেন? কেহবা স্বরূপ, কেহবা কুরূপ হয় কেন? হায়! কেন এ যুবকের রূপরাশি দেখিলাম। ছয় মাস এই পাপিষ্ঠের বন্দী হইয়া আছি, কই কই এক দিনও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখি নাই।"

দুর্জ্জনসিংহ যে সব নিরীহ প্রজাকে বন্দী করিয়াছিল, সুজনসিংহ কারাদ্বার খুলিয়া স্বহস্তে

তাহাদের মুক্তি দিতেছিলেন। তাঁহার কন্যা মদালসা বহুদিন হইতে দুর্জ্জনসিংহের অন্তঃপুরে বন্দী। অবস্থাবৈগুণ্যে সুজনসিংহ এতদিন কন্যার উদ্ধারের চেষ্টা করিয়া কৃতকার্য্য হন নাই। তবে তিনি মদালসাকে উত্তমরূপে জানিতেন। মদালসা কিছুতেই দুর্জ্জনসিংহের বশ্যতা স্বীকার করিবে না, তাহা তাঁহার বিশ্বাস ছিল। এজন্য ব্যস্ত হইয়া তিনি কিরণসিংহকে সর্ব্বাগ্রে মদালসার উদ্ধারের জন্য পাঠাইয়া দেন।

বিলম্ব দেখিয়া, তিনি নিজে অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। মদালসা ছুটিয়া আসিয়া পিতার বক্ষোলগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিল। সুজনসিংহ তাঁহার একমাত্র মাতৃহীনা কন্যাকে দীর্ঘকাল পরে কোলে পাইয়া সকল জ্বালা ভুলিলেন। সস্নেহে বলিলেন—"মা আমার! আমি আজ ছয় মাস কাল কেবল তোমার উদ্ধারের জন্য সেনা সংগ্রহ করিয়া বেড়াই-

তেছি। এ পাপিষ্ঠকে দুর্গাধিকার হইতে বিচ্যুত না করিলেও আমার ক্ষোভের কারণ হইত না। তোমায় লইয়া আমি পর্ণকুটীরে সুখী হইতাম।”

সুজনসিংহ কিরণকে দেখাইয়া বলিলেন “এই সাহসী রাজপুত যুবক আজ তোমার উদ্ধার সাধন করিয়াছেন। কেবল আমি নয় মা! তুমিও কিরণসিংহের নিকট কৃতজ্ঞতায় বিক্রীতা। কিরণের উপর এই পাপিষ্ঠ অত্যাচার না করিলে, প্রজারা বোধ হয় এত শীঘ্র বিদ্রোহী হইত না। আবার কিরণসিংহ আমার সহায় না হইলে, আজ এ দুর্গজয় আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।—”

দুর্জ্জনসিংহ এই সব ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রৌষধি-রুদ্ধবীর্য্য বিষধরের ন্যায়, ক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিল। কিন্তু সে সময়ে তাহার প্রতিহিংসার কোন শক্তিই নাই।

সুজনসিংহ, দুর্জ্জনসিংহের দিকে ফিরিয়া

বলিলেন—"পাপিষ্ঠ! তুই আমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছিস্, তাহার অপরাধ আমি মার্জ্জনা করিলাম। কিন্তু আমার কন্যার উপর যে অত্যাচার করিয়াছিস্, আজ ছয় মাস আমার কন্যাকে অবরুদ্ধ রাখিয়া, আমার বুকের ভিতর হইতে কাড়িয়া লইয়া, যে পাপ করিয়াছিস্, তাহার বিচার এই কিরণসিংহ করিবেন। আজ তুই শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে থাক্। আজ যে দরবারে বসিয়া, তুই কিরণসিংহের বিচার করিয়াছিলি, সেই দরবারে কল্য প্রাতে সহস্র সহস্র ভূমিয়ার সম্মুখে, কিরণসিংহই তোর বিচার করিবেন।"

তখন সন্ধ্যার কালচ্ছায়া, সমস্ত পৃথিবীকে ধীরে ধীরে প্লাবিত করিতেছে। দুর্জ্জনসিংহ দেখিল—তাহার অদৃষ্ট যেন এ অন্ধকারের অপেক্ষাও ভীষণ। সে বুঝিল—কাল প্রভাতে তাহার নিশ্চয় মৃত্যু। কিরণসিংহ ছাড়িয়া দিলেও—প্রজারা তাহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া

ফেলিবে। পাপিষ্ঠ ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে কাতরতাপূর্ণ বিশুষ্ক মুখে—একবার মদালসার মুখের দিকে চাহিল।

মদালসা—সে পাপিষ্ঠের মনোভাব বুঝিল। পিতার পায়ে ধরিয়া তাহার প্রাণ ভিক্ষা লইল। মদালসার অনুরোধে, সুজনসিংহ—জনকয়েক সিপাহী সঙ্গে দিয়া, তাহাকে—রাজ্যের সীমার বাহির করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কিরণসিংহের মাতার সংবাদ আমরা অনেকক্ষণ লই নাই। যে দিন দুর্গ বিজিত হয়, তাহার পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, এক শিবিকা আসিয়া কিরণসিংহের কুটীর দ্বারে থামিল। শিবিকা হইতে এক অনিন্দ্যসুন্দরী বাহির হইয়া ধীরে ধীরে সেই কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। শিবিকার অগ্রপশ্চাতে দশজন অস্ত্রধারী রক্ষক।

পশ্চাতে অশ্বারোহণে, এক সুন্দর যুবক সেই সুন্দরীর পশ্চাৎবর্ত্তী হইলেন।

বাটীর মধ্যে দাঁড়াইয়া, সেই সৈনিকবেশী পুরুষ—কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন "মা! মা! তুমি কেমন আছ?"

সম্মুখস্থ গৃহ হইতে এক বৃদ্ধা অতিক্ষীণ স্বরে বলিল—"বাবা! কিরণ কেমন আছিস্ বাপ্! ভগবান কি তোকে রক্ষা করিয়াছেন!"

সেই সৈনিকবেশী আর কেহই নহেন, স্বয়ং কিরণসিংহ।

কিরণ মাতার শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিল। সেই শীর্ণ গাত্রে হাত বুলাইতে লাগিল। এক প্রতিবেশিনী—সম্পর্কে কিরণের মাতৃষ্বসা, বৃদ্ধার সেবা করিতেছিল। কিরণ মা'র গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—"কেমন আছ মা?"

বৃদ্ধা স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—

"হয়ত এখন তোমায় না দেখিতে পাইলে মরিয়া—যাইতাম। বৎস! তোমায় আবার

ফিরিয়া পাইয়া—বোধ হইতেছে, আরও কিছুদিন বাঁচিব।"

কিরণ সেই রুগ্নার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে সকল ঘটনা বলিল। কিন্তু একটা কথা বলিতে তাহার বড় লজ্জা করিতেছিল। তবু সে মুখ নত করিয়া বলিল—"মা! তোমার সেবার জন্য একজন দাসী আনিয়াছি—চেয়ে দেখ!"

"কোথায় বাবা!"

"অই যে ওখানে দাঁড়াইয়া আছে।"

বৃদ্ধার দৃষ্টি, এতক্ষণ দ্বারের দিকে পড়ে নাই। কিরণের সেই ইঙ্গিতে সুন্দরী মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া বৃদ্ধার পদবন্দনা করিল।

কিরণের মাতা বলিলেন—"একি দাসী বাবা! এ যে রাজরাজেশ্বরী—আ মরি! এত রূপ!"

কিরণের মাতৃষ্বসা বলিলেন—"দিদি! বুঝিতে পারিতেছ না? কিরণ বিয়ে ক'রে বৌ

ঘরে নিয়ে এসেছে। আহা! ঠিক যেন স্বর্ণ-প্রতিমা দিদি!”

কিরণের মা বলিলেন—“কোথায় এ রত্ন কুড়াইয়া পাইলি কিরণ?”

কিরণ লজ্জার সহিত বলিল—“মা! দুর্গাধিপতি সুজনসিংহ আমায় এই কন্যা দান করিয়াছেন।”

কিরণের মা—সেই ক্ষীণশরীরে যেন কত বল পাইলেন। সেই শক্তিতে বৃদ্ধা কিরণের সাহায্যে, শয্যার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কিরণ বলিল—“মা! আরও একটী শুভ সংবাদ আছে। রাজা সুজনসিংহ, এই বিবাহের যৌতুক স্বরূপ তাঁহার দুর্গ ও জমীদারী আমাদের দান করিয়াছেন।”

বৃদ্ধা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ঊর্দ্ধনেত্রে একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে, যা না বুঝা যাইত, সেই বিশীর্ণ-গণ্ডপ্রবাহী অশ্রুজল—যেন তাহা

বুঝাইয়া দিল। বৃদ্ধা অস্ফুটস্বরে বলিলেন—"হায়! আজ যদি তিনি থাকিতেন? কিরণের বিবাহ দিয়া বৌ দেখিবেন, এ সাধ তাঁর বরাবরই ছিল!"

কিরণ বুঝিল, তাহার স্বর্গীয় পিতার কথা ভাবিয়া, সেই শীর্ণা বিধবা অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন। সান্ত্বনার স্বরে কিরণ বলিল—"মা! তুমি ত বল, মরিলেও হিন্দু স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক লোপ হয় না। আমরা প্রতিদিন কি করি বা না করি, পিতা তাহা দিব্যলোকে বসিয়া দেখেন। এ ঘটনাও ত পিতা দেখিতেছেন।"

এ প্রবোধে, বৃদ্ধার হৃদয়ে অপার সান্ত্বনা আসিল। বৃদ্ধা বধূকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"মা লক্ষ্মী আমার! তোমায় এই পর্ণকুটীরে কি করিয়া যত্নে রাখিব! তিনি থাকিলে কি রাজা সুজনসিংহের কন্যাকে, পুত্রবধূরূপে আনিয়া, এই মৃৎকুটীরে রাখিতে পারিতেন?"

কিরণ প্রবুদ্ধ স্বরে বলিল—"কেন ভাবিতেছ মা! তোমার পুত্রবধূ—তুমি যেখানে যে অবস্থায় রাখিতে পার, তাহাই করিও। কিন্তু আমাদের আর ঐ দীনাবস্থায় থাকিতে হইবে না। তোমায় লইয়া যাইবার জন্য পাল্‌কী ও সোয়ার আসিয়াছে। রাজা স্বজনসিংহ এখনই আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেন।"

বৃদ্ধা বলিলেন—"যে দুর্গে যাইতেছ, কিরণ! সেইখানে তোমার জন্ম হয়। তোমার পিতা স্বজনসিংহের অধীনে প্রধান সেনানী ছিলেন। তিনি যুদ্ধে নিহত হইবার পর—আমি মনোদুঃখে দুর্গ ত্যাগ করিয়া এই সুদূর স্থানে—নিভৃতে বাস করি। স্বজনসিংহ অনেক চেষ্টা করিয়াও আমায় দুর্গে লইয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু আবার ঘটনাক্রমে, সেই চির-পরিচিত কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে।"

মাতাপুত্রে এইরূপ কথোপকথন হই-তেছে, এমন সময়ে স্বজনসিংহ সেই কুটীরে

প্রবেশ করিয়া বলিলেন—“কিরণসিংহ! তোমার মা কোথায়? আমি তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি।”

সুজনসিংহের এ আগমন নিষ্ফল হইল না। তিনি—জামাতা, কন্যা ও বৈবাহিকাকে সঙ্গে লইয়া—দুর্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুত্রবধূ মদালসার শুশ্রূষায় ও অদৃষ্ট-পরিবর্ত্তন-জনিত মনঃসুখে, বৃদ্ধার শরীর আবার সারিয়া উঠিল। কিরণের দুঃখের সংসার, সোণার সংসার হইল। একদিন শুভবাসরে—শুভদিনে, এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে—সেই ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদুর্গ—আলোকমালায় উজ্জ্বলিত হইয়া, জ্ঞাতি কুটুম্বগণের কোলাহল-সম্পূরিত হইয়া, মিষ্টান্ন ও সুগন্ধের মিশ্র গন্ধসম্ভারে আকুলিত হইয়া—মদালসা ও কিরণের পরিণয়োৎসব ক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। বিবাহান্তে—দুর্গমধ্যে কয়েক মাস কন্যা জামাতা লইয়া—মনের আনন্দে কাটাইয়া—রাজা সুজনসিংহ প্রকাশ্যসভায়, কিরণকে

দুর্গাধিপত্য প্রদান করিয়া, বারাণসী যাত্রা করিলেন।

*　*　*　*

আর একদিন! সে দিনে রাত্রে দুর্গের উচ্চতম উন্মুক্ত বারদোয়ারির মর্ম্মর-ভিত্তির উপর বসিয়া—কিরণসিংহ ও মদালসা বাহ্য প্রকৃতির জ্যোৎস্নাপ্লুত শান্তিময় শোভা দেখিতেছিলেন। বৃক্ষশীর্ষে রাশীকৃত শ্যামল পত্রের উপর জ্যোৎস্না! পার্শ্ব-প্রবাহিতা নদী-বক্ষে জ্যোৎস্না! বারদোয়ারির শুভ্রচূড়ার উপর জ্যোৎস্না! নিশা-বিহারী উড্ডীয়মান পাখীগুলির, উন্মুক্ত পাখার উপর জ্যোৎস্না! দুর্গের পাষাণ-শরীরের উপরও জ্যোৎস্না! আর সেই জ্যোৎস্না-স্রোত ঘুরিয়া—ফিরিয়া, মলয়ের শীতল হাওয়া মাখিয়া, মদালসার সুন্দর মুখমণ্ডল স্পর্শ করিতেও ছাড়ে নাই।

কিরণসিংহ উদ্‌ভ্রান্তচিত্তে, সেই আলুলায়িত, সুকৃষ্ণ, কুঞ্চিত-কেশগুচ্ছ পরিবেষ্টিত, সেই

প্রভাময় অপ্সরমুখের সৌন্দর্য্য দেখিতেছিলেন। সেই কৃষ্ণতার সুন্দর নয়নে কেমন করিয়া প্রেমোচ্ছ্বাস বহিয়া, অতিশুভ্র জ্যোৎস্নার সহিত মিলিতেছিল, প্রেমবিহ্বল চিত্তে তাহাই দেখিতেছিলেন।

সম্মুখে এক ক্ষুদ্র বীণা পড়িয়াছিল। মদালসা সেই বীণা লইয়া তাহাতে সুর বাঁধিলেন। সেই উজ্জ্বল পূর্ণিমার রাত্রে, সে রজত দীপ্তির রাজ্যে—সুরতরঙ্গ মধ্যে যেন একটা নূতন সম্মোহিনী-শক্তি জাগিয়া উঠিল। মদালসা বলিল—"একদিন তোমায় গান শুনাইব বলিয়াছিলাম—রাজা! আজ সেই দিন।"

কিরণসিংহ বলিলেন—"মদালসা! আমার ধ্যানভঙ্গ করিও না! আমি তোমার ও অনন্ত সৌন্দর্য্যে আত্মহারা হইয়াছি। কেন জানি না, আজ এই চন্দ্রালোকিত নিশিতে তোমার ও সুন্দর কান্তি, আমার প্রাণে এক নূতন সঙ্গীত-ঝঙ্কার তুলিয়াছে।"

মদালসা—হাসিয়া বলিলেন—“ছি! অতটা ভাল নয়। আমি কি এত সুন্দর! তোমার ভুল হইয়াছে রাজা! একবার মুক্ত-প্রকৃতির দিকে দেখ দিকি! কেমন অনন্ত নীলাকাশ! নদীবক্ষে তরঙ্গরাজির উপর কেমন বিস্ফুরিত, নর্ত্তনশীল, চন্দ্রালোক! শ্যামল বিটপীর শাখান্তরালে, খদ্যোতের হীরকজ্যোতির উপর, উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার কেমন শুভ্র জ্যোতি! এই সুন্দর পার্ব্বত্য প্রকৃতির কেমন শুভ্র, পবিত্র উজ্জ্বল সুন্দর বেশ! এতদিন দেখিয়াছি, কিন্তু আজকের সৌন্দর্য্য যেন কত মধুর। ভাবিয়া দেখ রাজা! কত সুন্দর তিনি—যিনি এ সুন্দর জ্যোৎস্নার, সুন্দরী প্রকৃতির সৃষ্টি করিয়াছেন!”

কিরণসিংহের মন, সেই বিশ্বপাতার অনন্ত সুন্দর সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া উঠিল। সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে, মদালসার সৌন্দর্য্য ডুবিল। সেই বিরাট্ সৌন্দর্য্যের বাস্তব কল্পনার মধ্যে, প্রকৃতির সুন্দর শোভাও ডুবিল।

মদালসা বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া, সুরের সহিত কণ্ঠ মিলাইলেন। সেই জ্যোৎস্না-তরঙ্গে, সুর-লহরী মিশাইয়া গেল। তাহার সুকণ্ঠের সুর-তরঙ্গে—সেই জ্যোৎস্না-প্লাবিতা, সুপ্তা প্রকৃতি যেন আরও উজ্জ্বল রূপে হাসিয়া উঠিল। মদালসা বাহ্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া—বীণায় ঝঙ্কার তুলিয়া গাহিতে লাগিল,—

চিরসুন্দর তুমি, আঁখি সদা তোমারে হেরিতে চায়।
না জানি কি এক, আকুল পিয়াসা, মিলন আশা,
লইয়ে অন্তর তোমাতে ধায়।
দেখি পলে পলে, তবু না মিটে আশ,
ক্ষণেক বিরহে—করি হা হুতাশ,
এই কাছে পাই, আবার হারাই, মিলনের আশা মেটে না হায়!
সাধ হয়, হৃদি মাঝারে রাখিয়া,
যুগ যুগ হেরি, সদা লুকাইয়া,
সে আশা মেটে না, পূরে না কামনা—ছায়াসম কোথা ভাসিয়ে যায়
একবার যদি পাই হে তোমায়,
রাখিব লুকায়ে নিভৃতে হিয়ায়,
আর কাঁদিব না, আর ডাকিব না, বিকাইব তব—ও রাঙ্গা পায়।

বীণার স্বর ক্রমশঃ ডুবিয়া গেল। সে স্থকণ্ঠ বিরাম গ্রহণ করিল। বীণা থামিল, কিন্তু স্বর গেল না। তখনও যেন—সেই রজত-সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির বুকের উপর, মলয়ার দোলায় চড়িয়া, স্বর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। কিরণসিংহ এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান-বিহীন হইয়া, সঙ্গীত-তরঙ্গে ভাসিতেছিলেন। চিত্রার্পিত নয়নে—সেই চূর্ণ-কুন্তলা, রূপ-সৌন্দর্য্য-শালিনী, মদালসার মুখজ্যোতিঃ দেখিতেছিলেন,—এখন তাঁহার সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি মদালসার চিবুক ধরিয়া সাদরে বলিলেন—"প্রিয়ে! যে বিধাতা আজ আমায় সামান্য অবস্থা হইতে ক্ষুদ্র রাজ্যেশ্বর করিয়াছেন, তোমার ন্যায় দেবদুর্ল্লভ রত্ন আমায় মিলাইয়া দিয়াছেন—তাঁহাকে আমি করপুটে বার বার নমস্কার করি। এই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত, মলয়-চুম্বিত, স্থিরগম্ভীর সৌন্দর্য্যময়ী বিরাট প্রকৃতি—তাঁহার চিরসুন্দর রূপের একাংশের বিকাশ মাত্র। এ বিরাট ভাব চিন্তা করিলে

আত্মহারা হইতে হয়—আমাদের অতি-ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া তাঁহার কাছে মস্তক নত করিতে হয়। সত্য বলিয়াছ প্রিয়ে! প্রকৃতির এ সুন্দর সৌন্দর্য্যে যে ডুবিয়াছে, সেই প্রকৃত সৌন্দর্য্যের উপাসক।”

“আমি এ ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা—তুমি রাণী। আর এই প্রজাগণ আমাদের স্নেহের—আদরের জিনিস। কাহাকেও ভ্রাতৃরূপে, কাহাকেও পুত্র-রূপে, কাহাকেও পিতৃমাতৃরূপে, যথোপযুক্ত সম্মান ও স্নেহ বিতরণ করিয়া, আমরা এই রাজ্যের মধ্যে পুণ্য-কানন প্রতিষ্ঠা করিব।”

মদালসা—তাহার দেবপ্রতিম স্বামীর মনের কথা বুঝিল। ভক্তিভরে, অশ্রুপূর্ণ নেত্রে, তাঁহার চরণবন্দনা করিল। কিরণসিংহ—তাহাকে পবিত্র আলিঙ্গন-নিপীড়িত করিয়া—নীচে নামিয়া আসিলেন।

উপসংহার।

বস্তুতঃ কিরণসিংহ যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন-সময়ে সেই ক্ষুদ্ররাজ্য ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়াছিল। দেশে সুখ শান্তি—প্রজার মনে আনন্দ—দুর্ভিক্ষ ও মারীভয় আদৌ ছিল না। তখন দিল্লীশ্বর গৌরবান্বিত আকবর সাহ, দিল্লীর সিংহাসনে বিরাজমান। তিনি মহারাজ মানসিংহের মুখে—এই যুবক সামন্তরাজের সদাশয়তার ও উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া—কিরণসিংহকে "মহারাজ" উপাধিতে ভূষিত করেন ও প্রচুর জাইগীর দিয়া, তাঁহার অধীনে মধ্য রাজপুতানার সেনাপতি পদ প্রদান করেন। মদালসাও সকল কার্য্যে স্বামীর সহায়তা করিয়া, প্রজাদের পুত্রবৎ পালন করিয়া কর্ম্মময় জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করেন।

কিরণসিংহের মাতাও পুত্র পুত্রবধূ লইয়া আরও কিছুদিন এ সংসারে কাটাইয়া যান।

যশল্মীয়ারের এক ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য উপত্যকার, বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্রে—কিরণসিংহ কৃতজ্ঞতা-বশে—সেই বন্যছাগী কল্যাণীর স্মরণার্থে এক মন্দির ও তৎসংলগ্ন এক অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। আজও যশল্মীয়ারের—নিভৃত কেন্দ্রে অবস্থিত—মঙ্গলা নদীর প্রান্তসীমাস্থ পর্ব্বতের উপর, "কল্যাণী-মন্দিরের" ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। আজও কিম্বদন্তী, সেই নিভৃত কাননে, এক করুণ-রসাত্মক কাহিনীর স্মৃতির ছায়া অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভবিতব্য।

ভবিতব্য।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

৮৫৭ সাল। পশ্চিমে তখন সিপাহীর হাঙ্গামা। ঘোর অরাজকতা। চারিদিকে কেবল গুলির সন্ সন্ শব্দ, আর বন্দুকের দুম্ দাম্। সেই সময়ে আমি কাণপুরে কমিশেরিয়েটে চাকরি করিতাম। এই সাতান্ন সালের পর, যে সকল বাঙ্গালি পশ্চিম প্রদেশ হইতে প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় বাঙ্গলার শস্য-শ্যামল

ভূমি দেখিতে পাইয়াছিলেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে একজন।

কমিশেরিয়েটের চাকরী শুনিতে ভাল, কিন্তু হাঙ্গাম ঢের। লোকে বলে—কমিশেরিয়েট লুটের ভাণ্ডার। কিন্তু লড়াই বাধিলে যদি মাথাটা লুট না হয়, তাহা হইলেই রক্ষা। লড়াই বাধিলে যেমন লাভের পথ খোলা, তেমনি অন্যদিকে আবার অব্যর্থ গুলিতে প্রাণটা যাইবার পথও খুব প্রশস্ত। এ কথাটা যে দিবালোকের ন্যায় সত্য, তাহা একদিন বেশ টের পাইলাম।

কমিশেরিয়েটের বাবু—সুতরাং বড় বড় মিলিটারি সাহেবের সঙ্গে আমার খুব বনিয়া গিয়াছিল। অধিক কি, আমার মনিব, আমাকে অনেক সময় বন্ধুর ন্যায় ভাবিতেন। অত বড় সৈনিক পুরুষ, তথাপি তিলমাত্র দাম্ভিক ভাব দেখাইতেন না। আমি তাঁহার বাড়ী যাইতাম, তাঁহার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলা করিতাম, তাঁহার গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিয়া দিতাম,

মেম সাহেবের অনেক ফরমাস্ শুনিতাম। আর তাঁহার অনুকম্পায় শীঘ্র শীঘ্র আমার যথেষ্ট পদোন্নতিও হইয়াছিল।

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন লক্ষ্ণৌ প্রদেশে, সিপাহী বিদ্রোহের তীব্র স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়াছে। মফঃস্বলের কথা দূরে থাক্—নিজ সহরেই হুলস্থূল কাণ্ড! অতবড় সহরটার দোকানপাট প্রায় সবই বন্ধ, রাস্তাঘাট লোক চলাচল-শূন্য। গৃহ পরিজন-শূন্য, শকট আরোহি-শূন্য, ও নগর শান্তিশূন্য হইয়াছে। ইংরাজের আর সহরের রাস্তায় বাহির হইবার উপায় নাই। একক ইংরাজ দেখিলেই; সিপাহীর অলক্ষ্য গুলি আসিয়া তাহার মাথা উড়াইয়া দেয়।

আমি জেনারেল নিকল্সনের অধীনে বড় বাবু ছিলাম। এই বিদ্রোহের সময় একদিন মেম্ সাহেবের ঘরে বসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি। কথাবার্ত্তাটা অবশ্য সিপাহীদের সম্বন্ধেই হইতেছিল। এমন সময়ে জেনারেল সাহেব

আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আমায় দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! তুমি আসিয়াছ—ভালই হইয়াছে, তোমাকে বড়ই দরকার। তুমি না আসিলে আমি হয়ত এখনই আরদালী পাঠাইতাম। এই দেখ কমিশনার সাহেবের—হুকুম।"

আমি কমিশনার স্যর্ হেনরি লরেন্সের হুকুম পড়িলাম। আমার মনিব পাঁচশত গোরা সৈন্য লইয়া সীতাপুর যাইতে আদিষ্ট হইয়াছেন। সীতাপুরে গিয়া বিদ্রোহী সিপাহীদের গতিরোধ করিতে হইবে। আবার সেখানকার কাজ সারিয়া, হোসেনগঞ্জের প্রান্তে, দরিয়া-গঞ্জে ছাউনী গাড়িয়া, মফঃস্বলের বিদ্রোহীদের বাধা দিতে হইবে। হুকুম বড়ই জরুরি। সাহেব বলিলেন—"বাবু! দেখিলে ত, পরশ্ব ভোরে আমাদের কুচ্ করিতে হইবে। তোমাকে ত আমার সঙ্গেই যাইতে হইবে। অতএব কালই আমার স্ত্রী পুত্রদের, লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সিতে কমিশনার সাহেবের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও।"

আমি সাহেবের কথামত কাজ করিলাম, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যাইতে এবার বড় ভয় হইতে লাগিল। কোথায় বিঘোরে প্রাণ যাইবে—কোথায় সিপাহীর গুলি খাইয়া মাঠের মধ্যে পড়িয়া থাকিব—এই ভাবনাই প্রবল হইল। কোথায় কলিকাতা! কোথায় কাণপুর! কোথায় আমি—কোথায় বা আমার স্ত্রী পুত্র, এই প্রকার নানা দুশ্চিন্তায় রাত্রিটা কাটাইলাম। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই সাহেবের ছাউনীতে গিয়া মেম্ সাহেবের যাত্রার বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম।

সাহেব হৃষ্টমনে প্রাতরাশ খাইতেছেন। তিনি ত মাথাটা আগে বিক্রী করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, ভারতবর্ষে চাকরি করিতে আসিয়াছেন। তিনি সৈনিক পুরুষ—সমরেই তাঁহার আনন্দ। সুতরাং তিনি এ ঘটনায় স্বভাবতঃ প্রফুল্ল। সাহেব আমার বিষণ্ণমুখ দেখিয়া বলিলেন—"বাবু! ভয় কি—চিন্তা কি? তুমি আমার

সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকিবে—।” আমি ভাবিলাম “তোমার সঙ্গে থাকিলে মৃত্যুর সহিত আমার বড় দূর সম্পর্ক হইবে না। তোমার টুপীওয়ালা চিহ্নিত মাথাটী সিপাহীর গুলির নিশ্চিত শীকার বইত নয়? তোমার কাছে থাকিলে আমায় আগে মরিতে হইবে।”

সেই দিন দু’চার ঘণ্টা পরে, আমরা কাণপুর ছাড়িয়া লক্ষ্ণৌএর দিকে চলিলাম। আমার জিম্মায় রসদ—আবশ্যকীয় কাজ সারিতে আট দশ দিন লাগিল। তারপর আমরা দরিয়াগঞ্জের দিকে ফিরিলাম। ঘটনাবশে এখানকার কাজ আগে সারিতে হইল। দরিয়াগঞ্জের কাছে তির-ধূনার মাঠে আমাদের ছাউনী হইল। আমাদের দলে গোরাই বেশী। তদ্ভিন্ন শিখ ও একদল হিন্দুস্থানী সিপাহীও ছিল। ইহারা তখনও ইংরা-জের নিমক মানিয়া চলিতেছিল।

সিপাহীরা একদিন প্রাতে নটা দশটার সময় পাকাদি করিতেছে—এমন সময় কতকগুলি

স্ত্রীলোক ও বালিকা নিকটস্থ মাঠের দিক হইতে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ইহাদের দেখিয়া, সিপাহীরা রন্ধন ছাড়িয়া ব্যাপারটা কি দেখিতে ছুটিল। অর্দ্ধসিদ্ধ ডাল, আধপেষা আটা—আর ভিজা কাঠে ফুৎকারের চেষ্টা, একটা নূতন কৌতূহলের মধ্যে ঢাকা পড়িল।

আগন্তুকদের মধ্যে একটী বৃদ্ধা—তিনটী প্রৌঢ়া ও একটী বালিকা। সিপাহীরা তাহাদের কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহারা কোন কথার উত্তর দেয় না, কেবল চুপ করিয়া থাকে। তাহাদের বেশ ভূষা অতি মলিন, জাতিতে বেদিয়া বলিয়া বোধ হইল। প্রশ্ন করিলে উত্তর দেয় না দেখিয়া, সিপাহীরা তাহাদিগকে শত্রুর চর বলিয়া আটক করিল।

একজন সিপাহীর ধাক্কা খাইয়া, বুড়ী সর্ব্বাগ্রে ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল। ওঃ তাহার কি ভীষণ কর্কশ চীৎকার!! আজও তাহা আমার মনে আছে। বৃদ্ধার চীৎকারে

সকলেই চেঁচাইতে লাগিল। সিপাহীরা যত ধমক দেয়, বুড়ীও সুরের মাত্রা তত বেশী করিয়া চড়াইয়া দেয়। ক্রমে দেখিতে দেখিতে একটা মস্ত হট্টগোল হইয়া পড়িল।

এ প্রকার অবস্থায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে না পারিয়া আমি তাঁবু হইতে বাহির হইয়া সেইখানে গেলাম। সিপাহীদের বলিলাম—"ইহাদের ছাড়িয়া দাও, কেন বৃথা গোল বাড়াইতেছ।" সিপাহীরা বলিল—"বাবু সাহেব! ও হুকুম করিবেন না, এ বেটীরা শত্রুর চর! ছাড়িয়া দিলে কাহারও আর মাথা থাকিবে না।" আমি বলিলাম—"আচ্ছা! এক কাজ কর—তোমরা এইভাবে ইহাদের সাহেবের কাছে লইয়া চল। আমিও সঙ্গে যাইতেছি, বিচার করিয়া যাহা ভাল হয়, সাহেবই করিবেন, তোমরা আর ইহাদের তাড়না করিও না। এস আমার সঙ্গে এস।"

সিপাহীরা আমার যুক্তিটা শুনিল। আমার

হাতে তাহাদের ডাল রুটির বন্দোবস্ত, না শুনিয়াই বা করে কি? আমি আগে আগে চলিলাম, তাহারা পশ্চাতে চলিল। সর্ব্ব পশ্চাতে জনকয়েক সিপাহী। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহাদের সঙ্গে একটী দশম বর্ষীয়া বালিকা ছিল। বালিকাটী মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত হইলেও ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দেখাইতেছিল। তাহার সেই মলিনতার মধ্যেও যেন রূপের তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ ক্ষীণচ্ছটায় বাহির হইতেছিল। তাহার মুখে উজ্জ্বল প্রশান্তভাব; চক্ষুদ্বয় পূর্ণোৎফুল্ল; কেশ-ভার কুঞ্চিত, আলুলায়িত ও আগুল্‌ফলম্বিত; মুখখানি কুজ্‌ঝটিকাবৃত কমলিনীর ন্যায়। সে নিস্তব্ধ ভাবে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিতে করিতে পিছু পিছু আসিতেছিল! আমি তাহাকে এতক্ষণ কোন কথা জিজ্ঞাসা করি নাই, এক্ষণে হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমার বাড়ী কোথায় বাছা! তুমি এখানে কেন আসিয়াছিলে?"

সে প্রথমে উত্তর করিল না। আমি আরও মিষ্টস্বরে পুনরায় প্রশ্ন করিলে বালিকা তখন ভাঙ্গা বাঙ্গালায় উত্তর দিল,—"আমাদের ঘর দোর নাই, আমরা ভিক্ষা করিয়া খাই। সিপাহী-দের কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছিলাম—তাহারা আমাদের ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।"

এই কাঠখোট্টার দেশে, শ্রুতিকঠোর হিন্দুস্থানী ভাষার দেশের মধ্যে, এক অজানিত বালিকার মুখে বাঙ্গালা শুনিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলাম। একদিন শুনিয়াছিলাম—এদেশ হইতে বেদিয়ারা বাঙ্গালা দেশে গিয়া ছোট ছোট ছেলে ধরিয়া আনে। এ বালিকা কি তাই হইবে? আমার মনে বড় একটা কৌতূহল হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ওরা তোমার কে?"

বালিকা বলিল—"উহারা আমার আত্মীয়।"

"তুমি উহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াও কেন?"

"না ঘুরিয়াই বা কি করিব—ঘরবাড়ী নাই, কোথায় থাকিব ? আরও, লোকে আমায় দেখিলে কিছু বেশী ভিক্ষা দেয়। ভিক্ষা ছাড়া আমি হাত গুণিতেও পারি, তাই দু'চার পয়সা বেশী আয় হয়। অদৃষ্টের কথা বলিতে পারি বলিয়া উহারা আমাকে সর্ব্বদাই সঙ্গে রাখে, ও লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়।" বালিকা বোধ হয় জানিত না, বাঙ্গালীর মত অদৃষ্টবাদী জাতি জগতে খুব কম আছে।

আমি বলিলাম—"তুমি আমার হাত গণিয়া দিতে পার ? আচ্ছা ! হাতগণা এখন থাক্, বল দেখি সিপাহীদের সঙ্গে আমাদের কবে লড়াই বাধিবে ?"

একটা দশ বৎসরের বালিকা অদৃষ্ট-গণনা করিবে শুনিয়া আমার বড় হাসি পাইতেছিল। বালিকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"১৪ই তারিখে বিদ্রোহীরা তোমাদের আক্রমণ করিবে, তোমাদের অনেক লোক

মরিবে। তুমি বাঁচিবে এবং এই যুদ্ধে তোমার খুব সম্মান বাড়িবে।"

এ প্রকার গণনায় আমি যেন কিছু আমোদ পাইলাম। কিন্তু সাহেবকে এ মজাটা দেখাইবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

আমি বলিলাম—"আচ্ছা বেশ! জেনারেল সাহেবের কাছে চল, সেখানে আমি তোমাকে ঘৃত, ময়দা ও খাবার খাইতে দিব—নগদ পয়সাও দিব।"

বালিকা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। তাহার পরিচয় লইবার এত চেষ্টা করিলাম; কিছুতেই তাহা জানা গেল না।

বড় সাহেবের কাছে পৌঁছিলাম। তিনি তখন তাঁবুর মধ্যে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। আমাদের সঙ্গে একদল লোক দেখিয়া বলিলেন,—"বাবু! ব্যাপার কি?" আমি সব খুলিয়া বলিলাম—যুদ্ধ সম্বন্ধে গণনার কথাও বলিলাম। সাহেব একটু হাসিয়া বলিলেন—"বালিকাকে

ভিতরে লইয়া আইস।” বালিকা তাঁবুর ভিতরে গেলে সাহেব তাহাকে হিন্দিতে বলিলেন—“পরশু যুদ্ধ হইবে—এ কথা তুমি কেমন করিয়া জানিলে? সত্য কথা বল কোন ভয় নাই। আমি তোমাকে এনাম দিব।”

বালিকা বলিল—“আমি গণনায় জানিয়াছি।”

“সাহেব বলিলেন—“That's all humbug!” আমার সাহেবের পাশে তাঁহার সহকারী কাপ্তেন হরণ বসিয়াছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে বালিকার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিলেন,—“আমার অদৃষ্টে কি আছে বল দেখি, ঠিক বলিতে পারিলে পুরস্কার দিব।” হরণ্ সাহেব ঠাট্টা করিতেছিলেন, কিন্তু বালিকা তাঁহার হাত দেখিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল,—“পর্শুকার যুদ্ধে তুমি নিশ্চয়ই মরিবে।”

সাহসী সৈনিকের কাছে মৃত্যু ও প্রণয়-সঙ্গীত একই জিনিস। প্রণয়-গীতির ন্যায় মৃত্যুর

কথাও তাহাদের পক্ষে অতৃপ্তির বিষয় নয়। হরণ্ সাহেব খুব হাস্য করিয়া উঠিলেন, আবার বালিকার কাছে হাত লইয়া বলিলেন,—"বল দেখি, আমি মরিব কিসে?"

"বুকের ভিতর বন্দুকের গুলি গিয়া তোমায় আহত করিবে—আহত হইবার দেড় ঘণ্টা পরে তোমার মৃত্যু!! ঐ সময়ে যদি কেহ তোমার সেবা করে ত তুমি বাঁচিতে পার। কিন্তু তোমার সেবা হইবে না, ১৪ই তারিখে তোমার মৃত্যু নিশ্চয়।"

হরণ্ সাহেব মনে মনে কি ভাবিলেন—পরে পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বালিকাকে দিতে গেলেন। কিন্তু সে তাহা লইল না।

বড় সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমার হাত দেখ দেখি।" বালিকা হাতখানি ধীরে ধীরে ধরিল, পরে সবেগে তাহা ছুড়িয়া দিল! সাহেব বলিলেন—"কি দেখিলে?"

"আমি বলিব না।"

"না বলিবে ত দেখিলে কেন, কোন ভয় নাই, যাহা দেখিলে তাহাই বল।"

"না আপনি রাগ করিবেন—"

"না—আমি রাগ করিব না। আমোদের জন্য গণাইতেছি, রাগ করিব কেন? তুমি যা দেখিলে ঠিক বল—মিথ্যা বলিলে রাগ করিব।"

"বলিব—ঠিকই বলিব—আপনারও ১৪ই মৃত্যু হইবে।"

"কোন্ ১৪ই?"

"তা বলিতে পারি না—গণনায় তাহা দেখিতে পাইতেছি না।"

"আচ্ছা কিসে আমার মৃত্যু হইবে?"

"আঘাত—অপঘাত—রক্তোচ্ছ্বাসের মধ্যে!!"

জেনারেল একটু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা দেখা যাইবে। বাবু! ইহারা যা চায়, তাই দিয়া বিদায় করিয়া দাও, ইহারা গুপ্তচর নয়।" এই হুকুমে আমার সঙ্গের সিপাহীরা কিছু মনঃক্ষুণ্ণ

হইল। তাহাদের ইচ্ছা এই কয়টাকে একেবারে সঙ্গীনের মুখে তুলিয়া দেয়। হুকুম দিয়া সাহেব আবার লিখিতে বসিলেন। আমি বালিকাকে পুরস্কার দিয়া বিদায় করিয়া পুনরায় সাহেবের ঘরে গেলাম। হরণ্ সাহেব কিছু বিমর্ষ ও গম্ভীর। সাহেব বলিলেন,—"হরণ! তুমি কি একটা ছেলে মানুষের গণনায় ভয় পেলে নাকি? চুপ ক'রে কেন?"

হরণ্ হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ ভয় পাইয়াছি বটে!! বালিকার কথায় ভয় পাইব ত তরবারি ধরিয়াছি কেন? তবে এই ভাব্‌ছি পরশু যুদ্ধ হইবে, এ মেয়েটা কি করিয়া জানিল? বোধ হয় ইহারা গুপ্তচর! God bless my Soul!! উহাদের ছাড়িয়া দিয়া ভাল কাজ হয় নাই।" এমন সময়ে সাহেবের খানা আসিল, আমি নিজের আড্ডায় ফিরিয়া আসিলাম।

১৩ই কাটিল। ১৪ইএর প্রভাত হইল। আমার মনে কেবল সেই বালিকার কথা

জাগিতেছে। ভাবিলাম আজ ত ১৪ই, দেখি না কি হয়! সাহেবেরা পূর্ব্বাহ্ণ হইতেই সতর্ক। সকল সেনাই প্রভাত হইতে সশস্ত্র, শত্রুর গতিবিধি জানিবার জন্য কয়েকজন চরও পাঠান হইয়াছে। সে দিন অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—সৈনিকের গভীর পদ-বিক্ষেপ, অশ্বের যুদ্ধানন্দজাত হ্রেষারব ও ইংরাজ গোরার "হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে" চারিদিক আকুলিত করিতেছিল! -বেলা একটার সময় একজন চর ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, হজরতগঞ্জের মাঠে দলে দলে বিদ্রোহী আসিয়া জমিতেছে। সমস্ত দিনধরিয়া এইরূপে জমিতে পাইলে, তাহারা আমাদের ধূলিগুঁড়ি করিয়া দিবে।"

সাহেব এই সংবাদ পাইয়া, তখনই কুচ্ করিবার হুকুম দিলেন। আমাদের সৈন্যেরা একে-বারে বিদ্রোহীদের উপর গিয়া পড়িল। সমস্ত দিনই গুড়ুম্ গড়াম্ চলিল—সন্ধ্যার সময় আমা-দের সৈন্যেরা বিদ্রোহীদের তাড়াইয়া দিয়া জয়ো-ল্লাসের সহিত ছাউনীতে ফিরিল।

সাহেব ঘোড়া হইতে নামিলেন। তাঁহার মুখ, সমর-জয়োল্লাসেও বিষণ্ণ—অঙ্গে সমর-ক্লান্তি-জনিত স্বেদচিহ্ন, দুই এক স্থানে সামান্য রক্তের দাগ। আমার মনে বালিকার ভবিষ্যৎ কথা জাগিতেছিল। আমি সাহেবকে অক্ষত শরীর দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইলাম।

আমি বলিলাম—"কাপ্তেন হরণ্ কোথায়? তিনি ত ছাউনীতে ফিরিলেন না?"

সাহেব চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"তাইত ভাবিতেছি, তাহার ত কোন সন্ধান পাইতেছি না—হায়! তাহার সম্বন্ধে বালিকার ভবিষ্যৎবাণী বুঝি সত্য হইয়া পড়িল!"

আমি, বড় সাহেব ও চারি জন গোরা মশাল লইয়া, হরণ্ সাহেবকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। তখন সন্ধ্যার কালছায়ায় চারিদিক আচ্ছন্ন, ক্ষেত্রের উপর পতিত রাশীকৃত রক্তাপ্লুত—মৃত, অর্দ্ধমৃত নরদেহ। আমরা দুইপায়ে সেই সব রক্তাপ্লুত মৃতদেহ দলিত করিয়া চলিতে লাগিলাম।

বড় সাহেব ইংরাজের শব দেখিলেই, তাহা আলো ধরিয়া দেখিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ এই রূপে খুঁজিলাম, কিন্তু কিছুই হইল না। নিরাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় একটী মৃত অশ্বের পার্শ্বে একজন ইংরাজ ক্ষীণকণ্ঠে চীৎকার করিল —"জল দাও"! শব্দ সাহেবের কাণে গেল— মশালধারীরা নিকটে আসিল—আহত ব্যক্তির শোণিতাক্ত মুখের উপর মশালের আলো পড়িলে সাহেব চীৎকার করিয়া বলিলেন—"ওঃ হরণ! হরণ! তোমার এই শোচনীয় দশা!! হা পরমেশ্বর!" সাহেব নিজ হাতে মৃত দেহ সরাইয়া হরণের আহতদেহ উদ্ধার করিলেন।

এই সময়ে একটী বিদ্রোহী সিপাহী শয়িতাবস্থাতেই বন্দুকের ঘোড়া টিপিয়া বড় সাহেবের উপর লক্ষ্য করিতেছিল। আমার হাতে তরবারি ছিল—আমি বাঁটের বাড়ি সেই পিশাচের মস্তকে দারুণ আঘাত করিলাম! সে সেই আঘাতে বিকট চীৎকার করিয়া প্রাণ-

ত্যাগ করিল এবং তাহার নিক্ষিপ্ত গুলিতে সাহেবের পার্শ্বের একজন গোরা মরিল। সাহেব সব দেখিলেন। সহাস্থে—সকৃতজ্ঞতায় বলিলেন, "বাবু! তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে—এ কথা আমার চিরদিন স্মরণ থাকিবে।"

হরণ সাহেবকে আমরা ধরাধরি করিয়া দূরে ফাঁকা জায়গায় আনিলাম। তাঁহার আহত স্থান ধৌত করিয়া, জল ও ব্রাণ্ডি খাইতে দিলাম। কিছু বল পাইয়া হরণ বলিতে লাগিলেন— "ভাই! যুদ্ধের প্রথমেই আমি আহত হইয়াছি। এই দেখ আমার বুকের ভিতর দিয়া গুলি গিয়াছে, আর আমার জীবনের আশা নাই, দাও জল—জল—!" আমি জল দিলাম—হরণ বলিতে লাগিলেন—"জেনারেল, প্রিয়তম নিক্, তোমার নিকট শেষ বিদায়! কিন্তু আমার দুটি অনুরোধ। আমার গচ্ছিত টাকা বিলাতে আমার বৃদ্ধ মাতাকে পাঠাইয়া দিও। আর সেই বালিকা—সেই হতভাগিনী বালিকা!

ওঃ! তাহাকে যদি দেখিতে পাও, তাহা হইলে দুই শত মুদ্রা পুরস্কার দিও। তার ভবিষ্যৎ কথা সব সত্য। ভাই! তুমি সাবধানে থাকিও। আর একটু জল—প্রাণ যায়—বড় যাতনা।”

আমি জল ও ব্রাণ্ডি দিলাম, হরণ্ আবার বলিতে লাগিলেন—“ডিয়ার নিক্! আমি তোমার একটী উপকার করিব। তোমার সেই শেষ দিন—সেই সাংঘাতিক ১৪ই মে, যে দিন আসিবে, সেই দিন আমার প্রেতাত্মা তোমায় সাবধান করিয়া দিবে, বালিকার কথা সব সত্য—ভুলিও না।” কাপ্তেন হরণ্ বড় সাহেবের কোলে ঢলিয়া পড়িলেন—মৃত্যু তাঁহার সকল যাতনা শেষ করিল। আমি ভাবিলাম, সেই বালিকা যাদুকরী না হইয়া যায় না।

ইহার পর আট বৎসর কাটিয়া গেল। সিপাহীর হাঙ্গামা শেষ হইল। সাহেব খুব বাহাদুরী পাইলেন। বালিকা আমার সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ-বাণী কহিয়াছিল, তাহাও ফলিল;

অর্থাৎ আমারও পদোন্নতি হইল। কিন্তু বালিকা বড়-সাহেবের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিল, তাহা ফলিল না। পরমেশ্বর করুন, তাহা যেন মিথ্যা হয়। কত ১৪ই মে কাটিল—(এই তারিখ হইলেই সাহেব বিষণ্ণ হন)। আমি ভাবিলাম বালিকার কথা মিথ্যা হউক, আমার প্রভুর পরমায়ু বৃদ্ধি হউক।

সাহেব এক বৎসরের ছুটী লইয়াছেন—তিনিও বিলাত যাইবেন। আমিও দেশে ফিরিব, সবই ঠিক্‌ঠাক্। আমরা তখন মিরাটে।

একদিন আমরা বৈকালে বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছি—এমন সময়ে সাহেব বলিলেন, "বাবু! আজ কোন্ তারিখ? ১৩ই মে না?"

আমি বলিলাম—"হাঁ—আজ ১৩ই মে।" "ওঃ! কাল তবে ১৪ই।" সাহেব বড় বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন। আমায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "বাবু! আট বৎসর পূর্ব্বে হজরতগঞ্জের লড়াইয়ের মাঠে, বালিকা যা বলিয়াছিল, মনে

পড়ে? কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ে?” আমি বলিলাম—“ও সব কথা ভাবিয়া কেন আপনি বৃথা কষ্ট পাইতেছেন? প্রতি বৎসরের ১৪ই মে তারিখে ত আপনি এইরূপ বিষণ্ণ হন। কিন্তু কৈ কিছু ত হয় না। পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন—সে বালিকা মিথ্যাবাদিনী। হঠাৎ দুই একটা কথা লাগিয়া গিয়াছে বলিয়া কি, সবই সত্য হইবে?”

সাহেব বলিলেন—“বাবু! তুমি বিশ্বাস কর বা নাই কর, আমি ত সে কথা ভুলিতে পারিতেছি না।” এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া তিনি সহসা একটা কাজে উঠিয়া গেলেন। আমি চলিয়া আসিলাম।

১৪ই মে’র রজনী প্রভাত হইল। সমস্ত দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটিল।

সন্ধ্যা আসিল। আকাশে চন্দ্র উঠিল। চন্দ্রের বিমল আঁলোকে চারিদিক সুধা-ধবলিত হইল। আমরা সকলে বারাণ্ডায় বসিয়া বায়ু-

সেবন করিতেছি। মেম সাহেব স্বামীকে বলিলেন—"প্রিয়তম! পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। ১৪ই মে ত কাটিল—যখন সন্ধ্যা হইয়াছে, তখন আর কিসের ভয়? বাড়ী ত আর যুদ্ধক্ষেত্র নয়।" আমি ঘাড় নাড়িয়া মেম সাহেবের কথার সমর্থন করিলাম—কিন্তু আমি অদৃষ্টবাদী হিন্দু। মনে মনে বলিলাম, তোমার ভবিতব্যে যদি রক্তাপ্লুত শরীরে মৃত্যু লিখিয়া থাকে ত কেহই রাখিতে পারিবে না। সাহেব বলিলেন—"প্রিয়তমে! হেলেন!—এখনও আশ্বস্ত হইও না। যদি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নিরাপদে কাটে, তবে বুঝিব এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। কত ১৪ই মে কাটিয়াছে, কিন্তু আজকের মত মন কখনও এত কাতর হয় নাই।"

সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই ফটকের কাছে বিলাতী কুকুরটা ভয়ানক ডাকিয়া উঠিল। তাহার ডাক আর থামে না, সকলের চক্ষু সেই দিকে ফিরিল! কুকুরটা যেন কাহাকে

তাড়াইয়া কামড়াইতে যাইতেছে, অথচ পারিতেছে না। কিন্তু লোকজন কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র দ্বারের নিকট গেলেন, কুকুরটা তাঁহাদের দেখিয়া খানিক ক্ষণ থাঁমিল।

তাঁহারা চলিয়া আসিলেন, কুকুরটা আবার ভয়ানক চীৎকার আরম্ভ করিল। সাহেব নিজে ফটকের নিকট গেলেন, কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমারও ভয় পাইল। এক মুহূর্ত্তে তিনি শবের ন্যায় মলিন হইয়া পড়িয়াছেন। ঘটনাটা দেখিয়া আমার মনে হরণ্ সাহেবের মৃত্যুকালীন কথাগুলি মনে মনে হইল।

সাহেব বিষণ্ণমুখে আমাদের বলিলেন,—"তোমরা যে যার ঘরে যাও, আমি একটু বিশ্রাম করি।"

তিনি নিজের শয্যায় গিয়া নিস্তব্ধভাবে শয়ন করিলেন, রাত্রি তখন সাড়ে এগারটা। আর আধ-

ঘণ্টা পরেই ১৪ই মে কাবার! সুতরাং আমরা রাত্রে কেহই সে স্থান ত্যাগ করিলাম না। আধ ঘণ্টা নিরাপদে কাটিলেই বালিকার কথা মিথ্যা হইবে ভাবিয়া, আমি মনে মনে পুলকিত হইলাম। কিন্তু হায়! ভবিতব্যকে কে কোথায় ঠকাইয়াছে!!

আমরা পার্শ্বের ঘরে বসিয়া আছি। আমরা—অর্থাৎ সাহেবের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আমি। এমন সময় জেনারেল সাহেব আবার বাহিরে ছাদের বারান্দায় আসিলেন। মেম সাহেব তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে। ঘরে বড় গরম, সাহেব বারান্দায় বসিয়া হাওয়া খাইতে লাগিলেন।

দুই প্রহর হইতে দশ মিনিট বাকী আছে, এমন সময় সহসা আস্তাবলের দিক হইতে একটা ভয়ানক গোলমাল উঠিল। আমরা সকলেই ছাদের উপর আসিলাম। সেই গোলমালের মধ্যে স্ত্রীলোকের কাতর ক্রন্দনের উচ্চ শব্দ! ক্রন্দনের শব্দ ক্রমে কাছে আসিতে লাগিল।

সহসা এক স্ত্রীলোক রক্তাপ্লুত কলেবরে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া, সাহেবের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "খোদাবন্দ! রক্ষা করুন, আমার স্বামী ছোরা লইয়া আমায় খুন করিতে আসিতেছে—ঐ দেখুন—ঐ!" এ রমণীর নাম ফিরোজা। ফিরোজা সাহেবের বাবুর্চ্চির স্ত্রী।

ফিরোজার কথা শেষ হইতে না হইতে, দুর্ব্বৃত্ত বাবুর্চ্চি ছোরা হস্তে একবারে আমাদের কাছে আসিল। ফিরোজা সরিয়া পলাইল—সাহেব অন্য চাকরদের ডাকিয়া বলিলেন,—"এই হতভাগাকে আজ আস্তাবলে বন্ধ করিয়া রাখ্, কাল সকালে পুলিসে দিব।" সাহেবের কথা শেষ হইতে না হইতেই, দুরাত্মা উন্মত্ত ব্যাঘ্রবৎ তাঁহার উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহার তীক্ষ্ণধার ছোরা, সাহেবের বক্ষঃস্থল আমূল ভেদ করিল। সাহেব তখনই মাটিতে পড়িয়া রক্তমাখা হইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। বালিকার ভবিষ্যৎবাণী প্রত্যেক অক্ষরে তৃতীয়বার

প্রত্যক্ষ সত্যে পরিণত হইল। আমি ভাবিলাম, অদৃষ্টলিপি অখণ্ডনীয়; নতুবা আজ এ দুর্ঘটনা ঘটিবে কেন?

"আমরা সাহেবকে ধরাধরি করিয়া অনেক কষ্টে ঘরে তুলিয়া আনিলাম। তাঁহার বাক্-রোধ হইয়া গিয়াছে, সমস্ত শরীর রক্তে ভাসি-তেছে, বিছানা শোণিতস্রাবে ঘোর লোহিত-রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। সকলের দৃষ্টি ঘড়ির দিকে। দুই মিনিট পরে দ্বিপ্রহর বাজিল ও সেই সঙ্গে সাহেবের প্রাণবায়ু দেহ পরিত্যাগ করিল। তখন হজরত্‌গঞ্জের মাঠে সেই অদ্ভুত বালিকার ভবিষ্যদ্বাণী, কাপ্তেন হরণের শোচনীয় মৃত্যু ও জেনারেল সাহেবের শোচনীয় পরি-ণাম, আমার চক্ষের সম্মুখে মহা-বিভীষিকার সৃষ্টি করিল। সব ভুলিয়াছি? কিন্তু জেনারেল সাহেবের শোচনীয় পরিণাম ভুলি নাই।"

* * * *

ইহার পর ১৪ বৎসর কাটিয়াছে৷ আমি

এখন পলিতকেশ—অশীতিপর বৃদ্ধ। বাঙ্গালায় বসিয়া পুত্রপৌত্রাদি-পরিবেষ্টিত হইয়া সরকারী পেন্সন ভোগ করিতেছি। কিন্তু ১৮৬৯ সালের ১৪ই মে'র শোচনীয় লোমহর্ষণ ঘটনা আজও আমার চক্ষে স্পষ্ট চিত্রিত। আমি আজও চক্ষের সম্মুখে জেনারেল সাহেবের সেই রক্তাপ্লুত ভীষণ দেহ দেখিতেছি!!

তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস কর আর নাই কর—বিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোকে মুগ্ধ হইয়া আমায় বিদ্রূপই কর আর যাই কর, যাহা আমি আজও ভুলিতে পারিতেছি না—যাহা আজও আমার মর্ম্মে মর্ম্মে বিজড়িত, তাহাই তোমাদের বলিলাম। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, মনে রাখিও—"ভবিতব্য"ই—মানবজীবনের সমস্ত ঘটনার নিয়ামক। ভবিতব্যের শক্তি স্বয়ং বিধাতাও অতিক্রম করিতে পারেন না—তা মানব কোন্ ছার!

সমাপ্ত।